মৌন বসন্ত

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬১

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রক
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫ এ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ফ্যান্সী প্রিন্টিং কোম্পানী

সাড়ে তিন টাকা

অগ্রজপ্রতিম

মনোজ বসু

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

ঘসা কাচের মত কুয়াশার আস্তরণ পাতলা [illegible] এলো। সাদা পালকের মত হালকা হাওয়ায় উড়ে গেল যেন শীতের জলভারী বাতাস। নতুন কচিপাতা দেখা যায় আবার গাছের ডগায়! ঝরা পাতার নবজন্ম কিশলয়ে। হাস্নুহানার দিন ফুরোল, ফুরোল বড় বড় গাঁদার বাহার। চম্পকমাধবীর নয়নাভিরাম আগমনী, মালতী-বকুলের উৎসব লেগে যায়। আবার বসন্ত এসেছে।

বসন্ত এসেছে শহরের উত্তরের এই অন্ধ গলিটাতেও। শীতের সন্ধ্যায় চিমনীর ধোঁয়ার ভারে শহরে হাঁফ ধরে না। একটু নিশ্বাস নেয়া যায়। ফুরফুরে পাতলা বাতাস বুক ভরে টানা যায়। একটুকরো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বড় রাস্তার ফুটপাতে রক্তিম ফুলভারে নোয়ানো কৃষ্ণচূড়ার সরু ঝাঁকড়া ডালগুলো। ওই যে পাঁচতলা বাড়ীর বারান্দায় পোষা কোকিল একটানা ডাকে খাঁচায় ডানা ঝাপ্‌টে। কানে লাগে বাঁশীর মত, মনে এসে লাগে। জানালার ফাঁকে একটুকরো চারকোণা আকাশে মন উধাও। সামনে পাঁচিলে বাতাসের ধাক্কা যে-টুকু ঢুক পড়ে ঘরে, তাতেই নেশা ধরে যায়।

গলির শেষ বরাবর ভাঙা পাঁচিল দেয়া আকবরের আমলের বাড়ীটা। উঠোনে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে বাতাস এসে লাগে গায়ে। রোমাঞ্চ হয় শিশিরকণায়। এ কেমন হাওয়া গো! মন যে সব উল্‌টে পাল্‌টে

দিয়ে গেল। বাসন কখানা নিয়ে কলতলায় যেতে যেতে যেন হঠাৎ মনে পড়ে ওর কথা! দু' দুটা মাস হয়ে গেল চলে গেছে ওঁ আপিসের কাজে। জব্বলপুর, সিউনি চিন্দোয়ারা। এমন করে ত' মনে পড়েনি কোনদিন। চিন্দোয়ারা কতদূর কে জানে! কে জানে ও ভাবছে কিনা এখন শিশিরকণার কথা। বড় করে এক নিশ্বাস ফেলে শিশিরকণা।

বাসন নিয়ে আসে কলতলায়। বাটীটা মাজতে মাজতেই কতবার যে উন্মনা হয়ে যায় ও। একটা বাটীই মাজতে থাকে বারে বারে। কখন ঘোমটা খসে পড়েছে। কখন যে হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ও টেরও পায় না। কলতলার পাঁচিলের ওপরে যে-টুকু আকাশের নীল দেখা যায়, চোখভরে সেইটুকু দেখতে থাকে ও। গলিতে ফেরীওলার হাঁক, সাবান তরল আলতা চাই, মাথার কাঁটা কিলিপ্ চাই-ই-ই—! সম্বিত ফিরে আসে ওর। বাঁহাতি রোয়াকে চোখ পড়তেই দেখে ধীরেনবাবুর সোমত্ত ভাইটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে নিষ্পলক চোখে আর বিঁড়ি ফুঁকছে। আলগা সাড়ী গায়ে সাপ্টে নিয়ে বাসন মাজা সেরে ওপরে উঠে আসে শিশিরকণা। বড় অসভ্য এই ভাইটা—নাম বোধহয় সমরেন। রেডিওর দোকানের মিস্তিরি। সকালে বেরোয় দুপুরে খেতে আসে। কলে জল এলে বেরোয় আবার ফেরে রাত্রে। কতদিন ত' ধীরেনবাবু ঘুমিয়েই থাকে। দোর খুলে দেয় ফুলমণি। ধীরেনবাবুর দূর সম্পর্কের শালী। ফুলমণির সঙ্গে ছেলেটাকে নিয়ে কাণাঘুষোও ত' শুনেছে ও নীচের নুপুর-ঝুমুরের মায়ের কাছ থেকে। বিয়ে করলেই হয় বাপু! সব দিক থেকে দেখতাই-শোনতাই ভাল। পরের বউ-ঝি'র দিকে অমন করে তাকানটা বন্ধ হতে পারে তবু। বেহায়া কি শুধু ছেলেটা? মেয়েটাত' কম নয়। গা ধোওয়া দেখলে গা রী-রী

করে শিশিরকণার। বসে বসে গায়ে সাবান ঘষা। বসবার ঢঙ-ই আলাদা। তাকান যেন কেমন টেরচে-টেরচে। কি ঘেন্না!

ভেবে মনে মনে পুলকিত হলেও বাইরে নাকটা কুঁচকে ওঠে শিশিরকণার, বালিসে ওয়াড় পরাতে বসে ও। নীচের নুপুর-ঝুমুর কি বিচ্ছিরি! ফুলমনি ত' অসভ্যের শিরোমণি। আর তার পাশের ঘরের মালতী,—কেমন যেন সন্দেহ জাগে ওর আনাগোনায়। দেবযানী সেন একেবারে ছাদ লাগান ঘরখানায় যে থাকে, ওটার কথা ভাবতে হাসি পায় শিশিরকণার। পুরুষ-বন্ধুগুলোর সঙ্গে গা ঢলিয়ে ঢলিয়ে কি য়ে ফিস্ ফিস্ করে। নিজের তুলনায় এদের ছোট ভেবে ভারী আরাম লাগে ওর। ওর মত স্বামী কটা মেয়ের আছে? আর শাশুড়ী? শাশুড়ীর মত এমন ভালমানুষ শিশিরকণার নজরেই পড়ল না আজ অব্দি। ভাবতে ভাবতে ফিক্ ফিক্ করে হাসে ও। শাশুড়ীর বালিসের ওয়াড়টা পরাতে নিয়ে হঠাৎ বালিসের নীচে একখানা চিঠি দেখতে পায়। ওমা, এযে তারই নামের চিঠি!

ভ্রুদুটো ধনুকের মত কুঁচকে ওঠে। চিঠিখানা খোলে। খামের চিঠি খোলা কেন? কে খুলল এ চিঠি! চিঠির কাগজখানা মেলে ধরে শিশিরকণা।

"মনটা খাঁচার পাখীর মত ছট্‌ফট্ করিতেছে। ওগো, এমন স্থানে তোমাকে না লইয়া কেন যে আসিলাম তাহাই ভাবিতেছি। জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়। শুভ্র দুগ্ধফেননিভ বিশাল পাহাড় দুইদিকে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের কোলে নর্মদার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তুমি যদি দেখিতে! এমন দৃশ্য একা একা দেখিয়া প্রাণ ভরে না। আর চিন্দোয়ারা! কি শোভা মনোমুগ্ধকর দৃশ্যসমূহ—।"

অনেকগুলো কথারই মানে বুঝছে না শিশিরকণা। কি শক্ত বাংলা কথা। তবু অক্ষরগুলো যেন রসাভিসিক্ত হয়ে ওর মনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মার্বেল পাহাড়। জব্বলপুর। যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের ইসারা।

এলানো পড়ে থাকে বালিস আর ওয়াড়। পা ছড়িয়ে চুল খুলে বসে শিশিরকণা। বিহ্বল। কোথায় চিন্দোয়ারা। সেখানে কি যাওয়া যায় না—এখনি পাখা মেলে। মার্বেল পাহাড়েব পাশে নর্মদা নদীর ধারে গিয়ে ধরা যায় না তাকে! শিশিরকণার চোখের কোণে অশ্রুকণা জমে।

—এ চিঠিখানা আপনার বালিসের তলায় কি করে এলো মা?

বৃদ্ধা পিট্ পিট্ করে তাকায় দুবার।—কোন চিঠি?

শিশিরকণার কথা তেঁতো হয়ে ওঠে, আর ন্যাকা সাজলে কি হবে? সবই ত' জানেন। কেন আমার চিঠি খুলেছেন, লুকিয়ে রেখেছেন শুনি!

—আমি! অবাক করলে বাছা! তুমি কখন রেখেছ, মনে নেই তোমার।

—আমি এ চিঠি আপনার বালিসের তলায় রাখতে যাব কেন? নিশ্চয়ই আপনি রেখেছেন।

—মরণ আমার!—বৃদ্ধা যেন আকাশ থেকে পড়ে,—দেখ এ সব ছেঁড়া কলঙ্ক আমার নামে দিওনা, বারণ করে দিচ্ছি। পুত্তের বৌ-এর চিঠি আমি খুলব। কি ঘেন্না। যে রেখেছে তার হাত দুখানায় যেন কুষ্ঠ হয়।

—তাই হবে।—শিশিরকণার গলায় ঝাঁজ,—পরের মেয়ের ওপর যা নয় তাই অত্যাচার করলে কুষ্টই হবে।

বৃদ্ধা এবার তেলে-বেগুনে জলে ওঠে, মিছে কথা বোলনা। আসুক মধুসূদন। বলব সব। এমন রাক্কসীর হাতে আমায় রেখে গেচে। দিনরাত্তির বাক্যি যন্ত্রণা।

শিশিরকণা ঘাবড়ায় না, আসুক না। আমিও বলব।

—তাত বলবেই বাছা। দিন রাত্তির পুটু পুটু করে লাগিয়ে ত' আমায় বিষ করে দিয়েছ। এমন কোট্‌নার মেয়ে ঘরে এনেছিলুম! রক্ষে করো বাবা।

—আপনিই বা কম কিসে? এবার এলে বাপের বাড়ী চলে যাব। থাকব না আপনার কাছে। বুড়ী মরেও না। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শিশিরকণা।

রাগে দুঃখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপায়। এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না এ বাড়ীতে। আশ্চর্য! খানিক আগেই সে এই শাশুড়ীর জন্য কত গর্ব বোধ করেছিলো।

মালতী আসে ওর পাশে, কি হোল ভাই?

শিশিরকণা আকাশের দিকে তাকায়। উত্তর দেয় না।

মালতী পাশের ঘরে থাকে। বাসুদেব আর মালতী। স্বামী-স্ত্রী। কপোত-কপোতী। হিংসে হয় শিশিরকণার।

আবার বলে মালতী, কাঁদচো কেন, কি হোল?

শিশিরকণা শুধু বলে, সবই ত' শুনলেন।

মালতী সস্নেহে বলে, কেঁদোনা অমন করে। কি হোল শুনি?

শিশিরকণা মালতীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠ শুনে একটু নরম হয়, বলে জানেনত' ওর জীবন জ্বালিয়ে খেলে। ওঁর চিঠি এসেচে। সেখানা খুলে পড়ে লুকিয়ে রেখেচে। বালিস সরাতে গিয়ে পেয়েচি। বলতে আবার আমায় যেন মারতে আসচে।

মালতী হাসে, এমন ত' বড় একটা শোনা যায় না। ভারী মজা ত'।

—তোমার ত' মজা! মজাটা কি দেখলে শুনি!

মালতী কথাটা ঘুরিয়ে নেয়, না বলছিলাম খুব অদ্ভুত।

—শুধু কি আজ?—দুঃখের পাঁচালী পড়তে থাকে শিশিরকণা। বিয়ে হয়ে অব্দি জ্বালাচ্ছে। প্রথম প্রথম—কি বলব ভাই, বলতে মুখে বাধে। এক সঙ্গে শুতে দিতো না। বলত ছেলে আমার কাছে শোবে। ও বউ রাক্ষসী। ছেলে—বউয়ের নিশ্বাসে হেজে মরে যাবে।

—তাই নাকি? ভারী কৌতূহল মালতীর।

উৎসাহ পায় শিশিরকণা, ও আমার সঙ্গে একটু আড়ালে কথা বলবে, সে জো' ছিলো না। চোখদুটো ডাইনীর মত ঘুরত বুড়ীর। কথা বলতে এলেই আমায় ডাকত, আর সেই রাজ্যের যত ফরমাস।

মালতী চোখদুটো বিস্ফারিত করে।

—কি ঘেন্নার কথা ভাই। আপনাকে বলতে ঘেন্নায় মরি। দু'একদিন পড়শীরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে আমার কাছে শুতে পাঠালে বুড়ী কান পেতে থাকত। দোর বন্দ করবার উপায় নেই। দোর ঠেলতে থাকবে। ও বিরক্ত হয়ে দোর খুললে হয়ত বলত দেখ ত' ল্যাম্পর পলতে রেখেছি কিনা এ ঘরে। সব চালাকি, ছুতো। ল্যাম্পের পলতের তখন কোন দরকারটা শুনি? বলতে গেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে।

মালতী ভারী অবাক। বলে, তোমার স্বামী কি বলত?

—কি আর বলবে। মাঝে মাঝে বলত এখানে থাকব না, চলে যাব। বুড়ীর জ্বালায় ত' চলেই গেল। রেলের চাকরী, কোয়ার্টার ত' আছে, কিন্তু নিয়ে যেতে চায় না আমাকে। বেশী আসতে চায় না কলকাতায়। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। বুড়ী ছেলেকে দেশত্যাগী করেছে, এবার আমায় মারবে।

বলতে বলতে চোখে জল আসে শিশিরকণার। ঠিক বলছি দেখো আমায় মেরে তবে ওর শান্তি।

মালতী বলে, কেঁদোনা ভাই। কষ্ট ত' সংসারে আছেই।

মালতীর কাছে সব বলে কেঁদে কিছুটা হাল্‌কা হয় শিশিরকণা।

মনে মনে স্থির করে বেশ কড়া করে চিঠিখানি লিখতে হবে তাকে চিন্দোয়ারায়।

মালতী ঘরে চলে আসে। স্কুলে আজ ওর ছুটি হয়ে গেছে সকাল সকাল। এসে দেখে বাসুদেব একখানা মোটা বই মুখে করে বসে আছে।

ঘরে ঢুকেই হেসে গড়িয়ে পড়ে মালতী।

—কি হোল? বাসুদেব তাকায়। টিকালো নাকের দু'পাশে ভাসা ভাসা চোখদুটি ওর স্থিরগভীর। কোন কিছুতেই হঠাৎ উছলে ওঠে না।

মালতীর চাপা নাক, হাসলে গালে দুটি টোল্ পড়ে আর ছট্‌ফটে চিক্‌চিকে ছোট ছোট দুটি চোখ। ঠিক উলটো।

তবু কোথায় যেন একটা জায়গায় ওদের ভারী মিল। মালতী মাষ্টারী করে। বাসুদেব লেখে। মালতী যত ছট্‌ফট্‌ করে বাসুদেব ততো গম্ভীর হয়ে ওঠে, যেন ওর চাঞ্চল্যের পাল্লার ওজন সমান রাখতে। সবই ত ভাল। তবু ওদের ভাসা ভাসা অন্তরঙ্গতার কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অন্তরঙ্গ তবু যেন মাঝখানে এক ঠাণ্ডা কালো পাথরের প্রাচীর। এ পাথর যেন দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়।

রহস্যভেদ করতে এ বাড়ীর অনেকেই আদা-নুন খেয়ে লেগেছিলো, কিন্তু কি ফল হয়েছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী, তবু ব্যবহারটা ঠিক যেন তেমন নয়।

রাত্রির বিছানা ওদের ঘরের দুই শেষ প্রান্তে হয়ে থাকে।

নীচের প্রমীলা দেবী ত' বলেই ফেলেছিলো, উঠতি বয়েস, এক সঙ্গে শোবে, তা নয় এ আবার কি আদিখ্যেতা!

মালতী হেসে জবাব দিয়েছিলো, কেউ কাছাকাছি শুলে আমার ঘুম হয় না। বহুকালের অভ্যেস। ধীরেনবাবুর শ্যালিকা ফুলমণি বেহায়ার মত শুধিয়েছিলো একদিন, আপনি বুঝি ভাদ্দর-বৌ, বাসুদেব-বাবু বুঝি ছোঁবেনি আপনাকে।

মালতী গম্ভীর হয়ে বলেছিলো, তোমার চেয়ে বোধহয় পনেরো বছর বয়েস বেশী আমার। জ্যাঠামি করতে ইচ্ছে হলে এ ঘরে এসোনা।

ঠোঁট উল্‌টে কোমরটা দুবার পাক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো ফুলমণি। শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেও ছাড়েনি, বুঝতে ত' বাকী নেই কারো।

মালতী গ্রাহ্য করেনি। বাসুদেব ত' নয়ই।

মালতী দুটো কথা বলতে গেলে দুবার হাঁ হাঁ করে একটা মোটা বই মুখে তোলে বাসুদেব, নয়ত' দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বসে কলম হাতে

এক-একদিন মালতী ছাড়ে না। জোর করে নামিয়ে নেয় বই মুখের সামনে থেকে।

—এমন বোবা মানুষ দেখিনি।

বাসুদেব হাসে, বোবার শত্রু নেই মালতী।

—কেন আমিই তো তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাসুদেব কথা বলে না।

মালতীই হয়ত বলতে থাকে, তা নইলে এত জ্বালাই তোমায়। জীবনটা তোমার মাটি করে দিলুম, কি বলো?

বাসুদেব মৃদু হাসে, মাটি না করলে পাথর হয়ে যেতুম।

মালতী ভারী খুশী, খিলখিল করে হাসে, কথায় পারবার জো' নেই।

বাসুদেব আবার বইটা মুখের সামনে তোলে।

মালতী একফালি বারান্দায় রান্নার জায়গায় গিয়ে ডিম গুলতে থাকে। আজ মালতীর এত হাসি দেখে বাসুদেব অবাক। হাসি থামে না।

—কি হোল, হাসতে হাসতে মরে যাবে যে!

মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে মালতীর হাসতে হাসতে। খানিক পরে হাসি থামিয়ে বলে, মাগো, সংসারটা যেন চিড়িয়াখানা।

—এই সোজা কথাটা বুঝতে এত হাসি? বলে বাসুদেব।

হাসি আরম্ভ হয় আবার।

—আগে কখনও চিড়িয়াখানা দেখোনি?

যেন একটা খোঁচা খায় মালতী। গম্ভীর হয়ে বলে, দেখেছি।

মুখটা ওর কালো হয়ে ওঠে। ওর বিগত জীবনের ছবিগুলোর কোথায় যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাসুদেব। বলে, পাশের ঘরের শিশিরকণা বৌটির কথায় হাসছিলুম এতো।

বাসুদেব জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—কি কষ্ট বউটার। হাসি পায় বটে, কিন্তু ভাববার মতো। আচ্ছা, ওর বুড়ী শাশুড়ী ওকে অত কষ্ট দেয় কেন বলোত'?

—কি করে জানব? কি ধরণের কষ্ট?

—ধরো দিনরাত্রি গালাগালি। ছেলের কাছ থেকে সব সময় আলাদা করে রাখা।

—আলাদাই ত' ভালো।—খোঁচা দেয় বাসুদেব!

মালতীর কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে, বলে, তা বলচিনে। তবু বুড়ীর তাতে কি স্বার্থ?

কথাটা এড়িয়ে যায় বাসুদেব, ছেলেকে খুব বেশী ভালবাসে, তাই হয়ত ওই রকম করে।

—ছেলেকে ভালবাসলে ত' ছেলের বৌকেও ভালবাসবে?

—না। ছেলেকে যত ভালবাসবে, ততই বৌ-এর ওপর হবে আক্রোশ।

—ঠিক বুঝলুম না।

—মানে, বৌ ছেলেকে পর করে দেবে এই ভয়টা বেশী হয়।

—এ কেমন ভালবাসা?

—ভালবাসা কাকে বলে জানো?

এবারের খোঁচায় মালতী চটে,—না, জানি না।

—তবে বুঝবে কি করে?

—তবু এটুকু জানি ভালবাসলে সে যাতে আনন্দ পায় সেইটেই করা উচিত।

—ওটা তোমার পোশাকী ভালবাসা। ভালবাসার মানসিক বিলাস। আটপৌরে ভালবাসায় হিংসেটাও আসে প্রচুর।

—তুমি কি বলছ বুড়ী ছেলের বৌকে হিংসে করে?

নিশ্চয়ই।

—তুমি ভুল করছ, মায়ের স্নেহ নিঃস্বার্থ।

—সংসারের মায়ের স্নেহ নয়, জগতের মায়ের স্নেহ।

—জগতের মা আবার কে?

বাসুদেব কথা ঢাকে, থাক ও কথা। পরের আলোচনা মুখরোচক, কিন্তু মন খারাপ করে।

মালতী ছাড়ে না, পরের আলোচনা নয়। পরনিন্দা।

বাসুদেব হাসে।

মালতীর কথা বিষিয়ে ওঠে, কথা বলতে এলেই ঝগড়া।

—কই ঝগড়া করিনি ত' ?

—আবার ঝগড়া কাকে বলে ?

বাসুদেব বই মুখে করে বসে।

মালতী ঘরের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে।

ঘরের হাওয়াটা গুমট হয়ে ওঠে। হালকা করবার জন্যে মালতীই প্রথম কথা বলে। আজ লিখবে না ?

—সন্ধ্যের পর লিখব।

—অত কেরোসিন খরচ হলে কি করে চলবে ?

বাসুদেব এবার হেসে ফেলে, সুরু হোল ত' খরচা নিয়ে মেয়েলী কথা।

মালতী মনে মনে হেসে মুখে রাগ দেখিয়ে বলে, আমি মেয়ে যে ! মেয়েলী কথা বলব না ?

—তুমি যে মেয়ে সে কথা সত্যিই মনে থাকে না।

মালতীর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে কাছে আসে। বাসুদেবের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর কি মনে করে ওর জামাটায় হাত দেয়। জামার বোতামটা লাগায়। চুলগুলো আঙুল দিয়ে সমান করে দেয়, বলে, জামাটা কাল খুলে দিও। কেচে দোব। ময়লা হয়েছে।

বাসুদেব নীরব।

—আজ রাতে কি খাবে! রুটি ?

—হুঁ। বলে বাসুদেব।

মালতী ঘরের ওপাশে গিয়ে একটা থালায় আটা নামায়।

প্রায় নাচতে নাচতে চটি পরে ঘরে ঢোকে দেবযানী সেন। ওই ছাদের কোণের ঘরে থাকে। টানা টানা কাজলপরা চোখের ওপর

ছুটো নীলচে কাঁচ। টুকটুকে গায়ের রঙ। প্রসাধনের সাধনায় রূপ বেড়েছে চারগুণ বেশী। ঝক্ঝকে সাজান দাঁত দেখা যায় প্রায় সব সময়ই অন্ততঃ দুটি। একটু বোধ হয় উঁচু। কিন্তু ভারী মানায় ওকে ওই দাঁত দুটির জন্যে। ঘরে ঢুকেই বলে, কিছু মনে করবেন না অনধিকার প্রবেশের জন্যে।

মালতী এগিয়ে আসে।

বাসুদেব তাকায়। দেবযানী সেন, এম. এ। চাকরী করে। সরকারী ষ্টেনো। একটি ঘরে একা থাকে। দেশে বোধ হয় মা ভাই আছে। হয়ত নেই। কেই-বা খোঁজ করে।

ও নিজেই ওর যথেষ্ট পরিচয়। নিজেই সকলের আলোচনার সময় অনেকটা অধিকার করে থাকে। দেশ পর্যন্ত আর আলোচনা পৌঁছয় না।

কি মার্জিত ব্যবহার! কত সুন্দর রূপ! কি নয়নাভিরাম সজ্জার শিল্পানুরাগ। যেদিন লাল শাড়ী, সেদিন লাল জামা, লাল জুতো, এমন কি কানের পাথর দুটোও চুণীর। আর যেদিন সাদা, সেদিন কানের পাথর দুটো পোখরাজ অথবা হীরের। সব মিলিয়ে অপরূপ এই দেবযানী সেন এম. এ.। বান্ধবরা আসে বড় বড় হাম্বার অথবা ছোট ছোট টু-সীটারে। হয় স্যুট, নয়ত আদ্দির পাঞ্জাবী। সুবাস ছড়ায় বাতাসে। আতর অথবা ফ্রান্সের কোন দামী সেণ্টের! ঘরের সামনে গেলেই সুগন্ধ আসে নাকে। বোঝা যায় দেবযানী সেন আছে। কাচভাঙা হাসির শব্দে বোঝা যায় বান্ধবরাও আছেন।

বিনয় বোসের সঙ্গেই খাতিরটা বেশী। প্রায় রোজ সন্ধ্যায়ই আসে। পাতলা কাচের মত কাগজে মোড়া এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে, নয়ত' ব্রোকেট দেড় গজ। নিদেন দুখানা সিনেমার টিকিট ত'

থাকবেই মাঝে মাঝে। লোকটা কথা বলে কম। যদিবা বলে খুব আস্তে—একটু তোতলামীও যে নেই তা' নয়।

দেবযানীও পেয়ে বসে, বলে হয়ত, কি যে করেন রোজ রোজ। এত দেবার কি দরকার!

বিনয় বোস কথা খুঁজে পায় না, মানে এত' এমন কিছু নয়। রাগ করলেন?

দেবযানী হাসে, রাগ করাই উচিত আমার।

বিনয় চোখ নীচু করে বসে থাকে, যেন কত অপরাধী।

কড়াইশুটির সিঙাড়া আনে দেবযানী। নিজে হাতে বানিয়েছে আপিস থেকে এসে।

—নিন্, সিঙাড়া দুটো খেয়ে নিন।

বিনয় তাকাতে পারে না। একটু একটু করে সিঙাড়া দুটো খেয়ে নেয়।

দেবযানী ভারী খুশী, আর দুটো দিই।

বিনয় একটু হাসে এতক্ষণে, আপনার তৈরী?

—কি মনে হয়।—কৌতুক করে দেবযানী।

বিনয় বলতে পারে শুধু, আপনারই।

দেবযানী বলে, ঠিক ধরেছেন ত'।

বিনয় বোসের কানদুটো রাঙা হয়ে ওঠে। আর কথা বলতে পারে না।

এই লাজুক ধনীর ছেলেটিকে নিয়ে দেবযানী পুতুল খেলে। মনে মনে জানে ও। এটিই ওর অন্তরঙ্গ।

আর যারা আসে তারা বহিরঙ্গ।

আসে যায়। আবার আসে না। আবার হঠাৎ আসে।

অফিসের দু'চারজন অফিসারও আসে। কেরাণী ছেলে দু'চারজন হাফসার্ট, জীবনের ট্রাউজার কাবলী জুতো পরেও আসে। ঢোকবার আগে পকেট থেকে চারপয়সাওলা প্ল্যাষ্টিকের চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে নেয় লম্বা লম্বা চুলগুলো।

মুখটা একবার ঘসে নেয় নস্যি-মোছা রোমালে। একটা দু'পয়সাওলা সিগারেট ঠোঁটে লাগায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওঠে।

তাদের কথায় আবার একটু নাক সিঁটকানো ভাবও আছে'—বাড়ীটা বদলান মিস্ সেন। বড্ড পুরোনো।

দেবযানী একটুও অপ্রতিভ হয় না, বাসা পাই কোথা বলুন?

—কেন, খুঁজলে কি আর মেলে না। ষ্ট্রং ডিজায়ার থাকলে সব পাওয়া যায়। কি বলেন?

—কই আর পাওয়া যায়।—দেবযানীর চোখে কৌতুক, অবশ্য আপনার ষ্ট্রং ডিজায়ার ছিল বলেই হয়ত আজ এখানে এসেছেন।

—না, না। —সিগারেটটা শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে ছোকরা,—এই বেড়াতে বেড়াতে আর কি! এদিক পানেই আসছিলুম কিনা। চলুন না একটু বেড়াতে বেরোই!

—কোথায়?

—এই কফি হাউসে।

দেবযানীর ভারী মজা লাগে ছেলেগুলোর ছটফটানীতে।

মিষ্টি হেসে বলে, একটু কাজ আছে। আজ থাক।

ছোকরারা আর বেশীক্ষণ বসে না।

অফিসারদের আর একটু ভারী চাল।

—ছেলেটাকে দিলুম বিদ্যাপীঠে আর মেয়েটাকে লরেটোয়। আপনি কোথায় পড়েছিলেন মিস্ সেন?

দেবযানী বলে, বেথুনে ।

—থাকতেন হোস্‌টেলে ?

—হ্যাঁ ।

—আমিও ভাবছি হোস্‌টেলে রাখলেই ভাল । অবিশ্যি খরচাও ধরুন না কম নয় ত' ! মিসেসের একখানা পার্সোন্যাল গাড়ী কিনে দিতে হয়েছে । ড্রাইভার ত' দেড়শ'র কমে পাওয়াই যায় না ।

—অ ! তাই নাকি ? সায় দিতে হয় দেবযানীর ।

—আয়ার বলছিলো চলুন চিদাবরম, আমার দেশ । ভারী ভাল জায়গা । ভাবছি যাওয়া যাক না । ভাইজাগে ফ্লাই করে সেখান থেকে যাওয়া যাবে ।

—মন্দ কি ! —আবার সায় দিতে হবেই দেবযানীকে ।

—চলুন না আমাদের সঙ্গে ।

দেবযানী কাজের কথা পাড়ে, আমার যা রোজগার ।

—আপনার একটা প্রমোশনের চেষ্টা করছি । সত্যিই যা মাইনে পান ও ত' হাতখরচাতেই স্পেণ্ট্ আপ্ ।

—তাত' বটেই । —আবার সায় ।

অফিসাররাও ওঠে ।

একটি ছেলেকে শুধু বাগে আনতে পারে না দেবযানী । সে হচ্ছে নীচের প্রমীলা দেবীর বড়ছেলে রবীনকে । কি ভীষণ ইতর ছেলেটা । কলতলায় দাঁড়িয়ে শীষই হয়ত দিয়ে ফেললে । ন্যাষ্টি ! কানদুটো ধরে মলে দিতে হয় ।

বয়েস ত' কুড়ি বাইশ । কিন্তু কে বলবে । যা ষণ্ডার মত চেহারা । ধর্মের ষাঁড় ।

বিদ্যে ক্লাস সেভেন । কি এক ওষুধের কারখানার সেল্‌সম্যান ।

বিকেলে ক্লাবে যায়। ব্যায়ামও হয়, ব্রীজ খেলাও হয়। কোনদিন হয়ত বা তেতাসও।

মদ-টদও খায় কিনা কে জানে।

চোখদুটো বড় বড়। শিরগুলো ফুলো ফুলো।

ফরসা মুখে লাল ব্রণ।

এককথায় কদাকার। গা ঘিন ঘিন করে দেবযানীর।

দেবযানী যখন বেরোবে ইচ্ছে করেই তখন বেরোবে রবীন। আশ্চর্য বদবুদ্ধি!

দেবযানী জোরে হাঁটে। ও-ও ঠিক পাশে পাশে।

দেবযানী যে ট্রামে, সে-ও সেই ট্রামে। তাকাবে আর লাল দাঁত বার করে হাসবে।

কথা বলার ছুতো খোঁজে। দেবযানী কোন ছুতোতেই কথা বলে না।

কি স্পর্দ্ধা! দেবযানী সেন এম. এ.। আর ক্লাস এইট্ প্লাকড্ রবীন!

একদিন কিন্তু বলে ফেললে কথা। দেবযানী ট্রামে পাঁচটাকার নোট দিচ্ছিল। ভাঙানি ছিল না। বললে রবীন ফস্ করে, আমি দেব। খুচরো আছে।

দেবযানী উত্তর দিলে না।

কণ্ডাক্টরের কাছে ভাঙানী নেই। রবীনকেই পয়সা দিতে হোল।

রবীন আনন্দে পা নাচাতে থাকে। গুন্ গুন্ করে হিন্দী সিনেমার কি একটা গানের কলি। দেবযানী হিমালয়ের তুষার-গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকে।

বাসুদেব লক্ষ্য করে সব। কিছু কিছু শোনে মালতীর কাছ থেকে। চমৎকার উপন্যাসের চরিত্র। বাসুদেবের মাথায় উপন্যাসের ছায়া পাক

খায়। দেবযানী রবীন। কল্পনায় সবটুকু সত্য দেখবার চেষ্টা করে বাসুদেব।

প্রমীলা দেবী কিন্তু ভারী বিরক্ত। ঘরে বসে পানের বাটা খুলে দু' খিলি মুখে পোরে। একটু জর্দা ছিটিয়ে দেয় দাঁতের ফাঁক দিয়ে। চিবোতে চিবোতে বলে, হতচ্ছাড়ী।

পাশে বসেছিলো ঝুমুর। নুপুরের ছোট। ক্লাস নাইনে পড়ে। রঙ কালো, মুখে হাসি। বাপের রুটি বেলতে বেলতে বলে,—কে মা?

—ঐ যে ওপরের অপ্সরা।

মানে দেবযানী।

ঝুমুর শুধোয়, দিদি কি রুটি খাবে মা? বলছিলো গা-হাত ম্যাজ্ ম্যাজ্ করচে।

—তা হোক চাট্টি ভাতই খাবে।

নুপুর শুয়েছিলো পাশের ঘরে। চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর একটি বই নিয়ে পড়ছিলো এক মনে। নুপুর একটু মোটা, ফরসা। আই. এ. পড়ে! আবার গানও শেখে। একটু আলসে আয়েসী। নুপুরের উদ্দেশে একবার হাঁক দেন প্রমীলা দেবী, নুপুর কি ভাত খাবি?

নুপুরের সাড়া নেই। বুকের ওপর কাত করে ধরা উপন্যাসটির নায়িকার বিয়ের রাতের বাসরে গিয়ে হাজির হয়েছে তখন। নায়িকার চোখে জল। নায়ক এমন করে ফাঁকি দিলে তাকে। বিয়ে করলে না। নুপুরের চোখেও জল আসে-আসে।

—হ্যাঁলো শুনচিস্?

—কি মা?—উত্তর আসে এতক্ষণে নুপুরের কাছ থেকে।

ঝুমুর ভেতরে আসে। মাকে বলে, আমি গিয়ে শুধিয়ে আসছি।

ভেতরে এসে দিদিকে উপন্যাসে মসগুল দেখে বলে, কি বইরে দিদি?

নুপুর এবারেও উত্তর দেয় না।

বাসরের রাতে ছাদে নায়কের সঙ্গে লুকিয়ে কথা হচ্ছে নায়িকার। নায়িকা নায়কের পায়ের ওপর পড়ে কাঁদছে। চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে চন্দনের সাজ।

খপ্ করে বইটা কেড়ে নেয় ঝুমুর।

উঠে বসে নুপুর।—ভাল হবে না বলচি। দে বই।

ঝুমুর হেসে লুটোপুটি, কি বই দেখি। অ! এ ত' কবে পড়া হয়ে গেছে!

বইটা কিন্তু দেয় না।

নুপুর উঠে পড়ে।—দে বলচি। দিলি ত' পাতাটা গুলিয়ে।

—বেশ করেছি। দোব না। তোর ত' ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা সামনে। এ বই পড়চিস্ কেন?

—তোকে কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে? মুখে মুখে চোপা করবিনে।

ঝুমুর বই পেছনে নেয়, দোব না।

নুপুর উঠে এসে ওর হাত ধরে। কিন্তু ওর হাত থেকে নিতে পারে না।

ঝুমুরের খোলা বিনুনিটা ধরে নেড়ে দেয়। অসভ্য মেয়ে কোথাকার! সব সময়ই ইয়ার্কী ভাল লাগে না।

ঝুমুর চুলে টান্ লেগে উঃ আঃ করে কিন্তু হাসে তবু।

খুব হাসে।

নুপুর রেগে কাঁই, বাবাকে বলে দোব কিন্তু, বড়বোন বলে একটু তুমি আমায় মান্য করো না। ওর চোখ ছল ছল।

ঝুমুর বইটা ছুঁড়ে ওর চৌকীতে দেয়।—নিগে যা, তোর বই। ভারী ত'!

জানে যে বাবা নুপুরের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করবে। বাপ-আদুরে মেয়ে। তাই আর ঘাঁটাতে চায় না।

একটু যেন রেগে বলে, রাতে কি রুটি খাবি, না ভাত।

—যা খুশী। বলে নুপুর যে পাতাটা পড়ছিল সেই পাতাটা খুলতে যায়।

ঝুমুর বেরিয়ে আসে। মায়ের কাছে এসে ধুপ করে বসে, রেগে।

—কি বললে রে? প্রমীলা দেবী শুধোন।

—বলবে আর কি, সে এখন গল্পের বই পড়চে। ওপরের দেবযানী-দির কথা কি বলছিলে মা?

বলব আর কি? দিবারাত্রির কি কাণ্ডটা করে বেড়াচ্চে দেখছিস ত! ধিন্ ধিন্ করে নেচে বেড়াচ্ছে। ওপর থেকে নাবে যেন উটের মত।

উটের উপমায় ঝুমুর খিল খিল করে হেসে ওঠে।

বলে,—দাদা কিন্তু বলে খুব ভাল মেয়ে।

—তোর দাদা কত ভাল ছেলে! জ্বলে মলুম মুখপোড়ার জন্যে

ঝুমুর রুটি বেলা শেষ করে উঠতে যায়।

—প্রমীলা দেবী বলেন রুটি কখানা সেঁকে দে না মা। আমি ততক্ষণ ওনার ঘরটা ঠিক করে রাখি।

ওনার মানে ঝুমুরের বাবা মন্মথবাবুর। মন্মথবাবু উকিল আধমাড়া চেহারা। কালো ছেঁড়া চাপ্‌কান পরে বেরোন যখন বর্ষায়, ভেজা কাকের মত মনে হয়।

কোর্টের আনাগোনার তুলনায় টাকার আমদানি কম। যাও-বা আসে, এক আধলাও থাকে না। এর ওর কাছে ধার কর্জ করতে হয়।

ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে ভিক্ষের মত করে চাইতেও হয় বন্ধু-বান্ধবের কাছে।

কারণটা বড়ই মর্মান্তিক।

খরচার টাকা না নিয়ে এলে প্রমীলা দেবীর কথাগুলো পাওনা হয়েই থাকবে। সেই পাওনা থেকে বাঁচতে গিয়ে দেনা এমন কি ভিক্ষে করতেও দ্বিধা করেন না মন্মথবাবু।

যেদিন কোথাও কিছু আর জুটল না, ফেরেন সেদিন অনেক রাত করে। খুব ভয়ে ভয়ে।

প্রমীলা দেবী হয়ত ঘুমাচ্ছেন। রবীন তখনও ফেরেনি। নুপুর চোখ বুজে শুয়ে কত কথার রঙে রঙীন ছায়ায় আর কল্পনায় ডুবে আছে। ঝুমুর উঠে দোর খুলে দেয়।

ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন মন্মথবাবুর, তোর মা ঘুমিয়েছে?

—হ্যাঁ বাবা।

—সকলের খাওয়া মিটে গেছে?

—না, দাদা ফেরেনি, তুমি ফেরোনি, কি করে হবে?

ঘরে ঢুকে মন্মথবাবু পোষাক ছেড়ে বলেন ঝুমুরকে আস্তে আস্তে, এক কাপ চা দে ত' মা!

—উনানে ত' আগুন নেই বাবা। দিই, কাঠ জ্বালিয়ে করে দিই।

—না থাক কাজ নেই।

মন্মথবাবু উঠে হাত পা ধুয়ে আসেন।

প্রমীলা দেবীকে ডাকে ঝুমুর, বাবা এসেচে মা।

প্রমীলা ওঠেন।

মন্মথবাবু ঘরে ঢুকে জাগ্রত কালীর মত প্রমীলা দেবীকে দেখে চোখ নীচু করে বিছানার দিকে যান। বোঝেন ঝুমুর

ডেকেছে ওর মাকে। ডা'তে বারণ করে হাত পা ধুতে গেলেই হোত।

ঝুমুরকে বলেন, একটা চাদর দে ত' মা। কেবল শীত শীত করছে শরীরটা কেমন ধারা মনে হচ্ছে।

—কি আবার মনে হচ্ছে? চাট্টি বরং মুখে দিয়ে শোও।

মন্মথবাবু ওঠেন, খিদেও পেয়েছে,—দে।

খেতে দেয় ঝুমুর। প্রমীলা বসে থাকেন পাশে।

মন্মথবাবু ভয়ে ভয়ে খান। কখন টাকার কথা বলে বসে।

ঠিক বলেন প্রমীলা,—আজ টাকা এনেছ ত'?

মন্মথবাবু ভাত মুখে পুরে কি বলেন বোঝা যায় না। হ্যাঁ-ও হতে পারে না-ও হতে পারে।

—কাল ভোরেই ত' আসবে গয়লা। তাছাড়া কয়লা নেই। ভোরে উনুন ধরবে না কয়লা না আনলে!

মন্মথবাবু ভাতগুলো গিলতে পারেন না। হেঁচকী আসে।

—টাকা এনেছ?

মিন মিন করে বলেন মন্মথবাবু—কই কতো ত' বললুম কিছুতেই দিলে না।

—পাওনি টাকা।—প্রমীলা দেবীর কণ্ঠস্বর এবার বেশ উত্তেজিত—আমার আর কি। কাল গয়লার দুধ আর খেতে হবে না। গয়লার জুতো খেও। বলেছে টাকা না দিলে জুতোবে। একটু হায়াও নেই গা। পাঁচটা লোকের সামনে হেনস্তা করে যা নয় তাই বলে যাবে। তোমার না হয় মান সম্মান না থাকতে পারে, আমাদের আছে।

ঝুমুর বাবার অবস্থাটা বোঝে। মন্মথবাবুর খাবি খাবার অবস্থা।

ঝুমুর বলে, আমি গয়লাকে বুঝিয়ে বলব। শুনবে না কেন?

—তুই চুপ কর।—ধমকে ওঠেন প্রমীলা দেবী।

প্রমীলার ধমকে নুপুরের জেগে জেগে স্বপ্ন দেখাটা মাটি হয়ে যায়। সবে সে কলেজের সেই সুন্দরপানা বড়লোকের ছেলেটির সঙ্গে যাচ্ছিল একটা চ্যারিটি শোতে। ছেলেটি কথা দিচ্ছিল তাকে গান শেখাবে, তারপর—।

ব্যস্ তারপর মায়ের ধমক।

প্রমীলা দেবী বলেন—গয়লা না হয় মেয়ের মিষ্টি কথায় গলে গেলো। কয়লা কোথেকে আসবে শুনি? সকালে চা গিলবে কোথেকে শুনি। আমার মাথা দিয়ে আগুন ধরবে?

ঝুমুর বলে, দিদির কাছে দেখেছি দুটাকা দশ আনা আছে। তাই দিয়ে না হয় কয়লা আসবে।

নুপুর হিমালয় থেকে ধুপ করে বসে পড়ে। ঝুমুরটা কি শয়তান। ওর ব্যাগ খুলে টাকা পয়সা কটা গুনে রেখেছ! আবার বলে কিনা কয়লা আসবে কাল ভোরে। কত কষ্টে সে জমিয়েছে টাকা দুটো কলেজের পিক্‌নিকে চাঁদা দেবে বলে। সেই পিক্‌নিকেই যাবে ওই ছেলেটি। ভাসা ভাসা চোখ। টুকটুকে রঙ। আস্তে আস্তে গান গায়। ওর কাছাকাছি যে নুপুরকে যেতেই হবে।

ঝুমুর দিলে সব ভেস্তে।

মন্মথবাবু ততক্ষণে আঁচিয়ে চাদর মুড়ি।

প্রমীলা দেবী গজ্ গজ্ করতে করতে খেতে বসেন.

ঝুমুর ডাকতে যায় এবার নুপুরকে।

—ও দিদি। খাবি আয়।

নুপুর ঠেলা মারে ওকে,—যা, খাব না।

—কেন রে। আয়, মা বসে আছে।

—ফের ডাকছিস। বলছিনে খাব না।

ঝুমুর একটু ভেবেই আন্দাজ করে বলে, গোঁসা হল নাকি? কার ওপর?

নুপুর কথা বলে না।

ঝুমুর নুপুরের কানের কাছে মুখটা নিয়ে বলে, তোর টাকা বাবার কাছ থেকে আদায় করে দোব। ভয় নেই।

নুপুর ঝাম্‌টা দেয়, আঃ! সুড়সুড়ি লাগচে।

—আয় ভাই দিদি লক্ষীটি আয়।

নুপুরের রাগটা নরম হয় ওর সাধাসাধিতে, বলে,—চলো।

এমনি করেই দিন কাটে। মন্মথবাবুর অবস্থাটা বোঝে ঝুমুর। কিন্তু মন্মথবাবু ভালবাসেন নুপুরকে। হিংসে যে ঝুমুরের হয় না এমন নয়। কিন্তু ভালবাসা না পেয়ে তাই নিয়ে মান অভিমান করতে বড় লজ্জা হয়, শুধু লজ্জাই নয় ওর ধাতই অমন নয়। সংসারে সকলেই সবকিছু পায় না—এই মস্ত সত্যটা ও উপলব্ধি করেছে। তার জন্যে হাঁক ডাক করাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। একথাটা ও বোঝে মর্মে মর্মে।

টাকা যেদিন পেলেন সেদিন হয়ত মন্মথবাবু নিয়ে এলেন এক ঠোঙা চপ্। গোটা বারো। তা থেকে চারটেই হয়ত খেলো নুপুর।

মন্মথবাবুকে এসে হয়ত' শুধোলে নুপুর—কি এনেছো বাবা?

—গরম চপ্ আছে। খাবি?

—দাও না।

মন্মথবাবু গোটা চারেক তুলে দিলেন ওকে।

ঝুমুর পড়বার ঘরে বসেছিলো; দেখল, তবু এগিয়ে বলতে পারল না, কি এনেচ বাবা?

কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে।

তাছাড়া যদি না দেয়। যদি তাকে লোভী ভাবে। নানা বাধা এসে জড় হয় মনে।

যেতে আর পারে না ঝুমুর।

প্রমীলা দেবীর হাতে যখন সেই ঠোঙা যায়, ঝুমুর এগোয় তখন।

প্রমীলা ভাগ করেন।

ঝুমুর বলে, দাদার জন্যে চারটে রাখো।

তুই নে, বলে হয়ত মাত্র একটা তুলে দেন ওর হাতে প্রমীলা দেবী।

ঝুমুর একটা খায়। ওতেই ওর তৃপ্তি।

নুপুর চারটে খেয়েছে বলে কোন ক্ষোভ নেই ওর মনে। নুপুরের যেন বেশী পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর ওর অল্প পাওয়াটাও নিতান্তই সাধারণ নিয়ম।

এর ভেতর অস্বাভাবিক ত' কিছুই দেখতে পায় না ঝুমুর। ছোটবেলা থেকে এমনিই হয়ে আসছে, এমনিই হবে। দাবীটা নুপুরের বেশী।

হয়ত বলে, দুটো টাকা দাও না বাবা?

মন্মথবাবু বলেন, কেন রে?

—সিনেমা যাব।

মন্মথবাবু একটু হেসে দুটো টাকা দিয়ে দেন।

ঝুমুর দেখে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। ওর ইচ্ছে হয় ইস্কুলের ললিতাদিদের সঙ্গে যায়—ওই শ্যামবাজারের হলের ছবিখানা দেখতে, কিন্তু বলতে পারে না কিছু। কেমন লজ্জা লাগে। যদি বাবা কিছু মনে করেন!

কিছুক্ষণ পরে নুপুরকে গিয়ে একবার বলে,—কার সঙ্গে যাবিরে দিদি?

—কার সঙ্গে আবার। একাই।

ঝুমুর বলে ফেলে ফিস্ ফিস্ করে, আমায় নিবি ভাই।

নুপুর মুখ ভার করে। ঠোঁট উলটোয়, বয়ে গেছে। তুমি বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নাও। দেখে এসো।

ঝুমুর হাসতে হাসতেই বলে, বেশ নিবি না ত' নিবি না।

বলে চলে যায়।

মন্মথবাবুর কাছে চাইবার সাহস আর ওর হয় না।

পড়াশুনোয় নুপুর ঝুমুরের চেয়ে অনেক ভাল। নুপুর প্রথম বিভাগে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে পড়ছে। ঝুমুর একবার অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করে নবম শ্রেণীতে কোনভাবে উঠেছে। তাই সংসারের কাজ সবই ঝুমুরের কাঁধেই চাপে।

নুপুরকে বললে বলে, আমায় পড়তে হবে মা।

প্রমীলা দেবী ভাবেন, পড়াশুনোয় এত মাথা। যাক ও পড়ুক। ঝুমুরই বরং করে দিক কাজটা। ঝুমুর বলতে পারে না ওর পড়া আছে। বলতে বাধে। ওকে যদি বলে বসে থাক্ আর পড়তে হবে না। পড়ে ত' স্বর্গ উলটে দিলে। খুব হয়েছে। বরং সংসারের দু'খানা কাজ করো। ঝুমুর বই ফেলেই ওঠে। কাজগুলো করে দেয় মায়ের হাতে হাতে। বটনা বাটা, কুটনো কোটা, বাটিটা থালাটা ধুয়ে আনা। জল তোলা।

নুপুর পড়ে। হয়ত উপন্যাসই পড়ে! ঝুমুর দেখেও কিছু বলে না।

রবীন ওরই ভেতর ঝুমুরকে একটু ভালবাসে। নুপুর পড়াশুনোয় ভাল, আদর বেশী। তাই ওর উপর রবীন খুব প্রীত নয়।

হয়ত বেরোবার সময় পকেট থেকে এক খাবলা চীনে বাদাম বার করে বলে,—ঝুমুর নে খা'। ঝুমুর নেয়।

নুপুর হয়ত বলে, আমায় দাও দাদা।

রবীন বলে, তুই বাবার কাছে দুধ সর খে'গে যা। এ সব তুই কি খাবি।

বলে হাতটা গোটাতে গোটাতে চলে যায় ক্লাবে।

ঝুমুর নিজের বাদামের অর্ধেকটা ভাগ করে নুপুরকে দেয়।—নে দিদি খা'।

রবীন বেরোতে বেরোতে একবার ওপর দিকে তাকায়। কে জানে দেবযানী সেন এসেচে কিনা ঘরে। সাড়া শব্দ ত' তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। যাবে না কি একবার ওপরে।

বাসুদেব লক্ষ্য করে রবীনকে বারান্দা থেকে।

বাসুদেবের মাথায় পাক খায় উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলো।

উপন্যাস লিখছে বাসুদেব। প্রেম যেখানে পূর্ণ আত্মার আলোয়—এমন প্রেম কি মেলে না সংসারে ? ভাবতে থাকে বাসুদেব। সংসারের রোজনামচার কোন কোন পাতায় ময়লা লাগে কাদা লাগে কত তুচ্ছমত জটিল ঘটনায় বিষিয়ে ওঠে নতুন নতুন জীবন, যারা চেয়েছিলো নিছক প্রেম। 'শুধু ভালবাসি' এই কথাটুকুতেই ভরে রাখতে পারে না দিন-রাত্রির গহ্বর। ভালবাসি। আর কিছু না। আর কোথাও না। আর কেউ না। ভরাভতি ভালবাসার অমৃত আস্বাদ। কই এমন ত' শুধু ভাবাই যায়। চোখে পড়ে না। ভাবা গেলে চোখে পড়বে না কেন ?

হয়ত নীচে নেমেছে দেবযানী ভোরে।

রবীন ক্লাব থেকে ব্যায়াম সেরে ফিরছে।

দেবযানী তাকায় ওর দিকে একবার যেমন তাকায় লোকে দেয়ালের দিকে।

রবীন তাকায় না। শীষ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে যায়। মুখটা কিন্তু ওর শুকিয়ে ওঠে।

ঠিক নটায় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যায়। দেবযানী সেন নামছে।

সেদিন রবীনও ঠিক সেই সময়ই হয়ত বেরোচ্ছে।

রবীন দাঁড়ায়। দেবযানী নেমে গেলে পিছন পিছন চলে রবীন যাতে দেবযানী তাকে না দেখে। দেখলে হয়ত কি মনে করে বসবে কে জানে।

দেবযানী কিন্তু দেখেই ফেলে। ট্রামে ওঠবার আগে পাশ ফিরে তাকাতেই চোখ পড়ে রবীনের ওপর। রবীন তক্ষুনী মুখটা ঘুরিয়ে নিলেও নজরে পড়ে দেবযানীর গম্ভীর মুখ আর বিরক্ত উদাসীন দৃষ্টি। রবীন একটু যেন আহত হয়। কেনই বা মেয়েটাকে সে ভয় ভয় করে চলছে। ভারী ত' একটা ওম্যান! রবীন মনে খুব সাহস আনবার চেষ্টা করে।

বেশী কিছু বললে সে-ও শুনিয়ে দেবে পাঁচ কথা। সে কি আর দেখছে না, আপিস থেকে দেবযানী এলে কত লোক তার ঘরে আসে! দু' দিনে ঢিট্ করে দেবে ওকে সে। পাততাড়ি গোটাতে হবে। পাড়ার রকে আড্ডা-দেয়া ছেলে সে। হাঁ করলে অন্ততঃ একশজন বন্ধু বেরিয়ে আসবে হাত গুটিয়ে। দরকার হলে দেবযানী সেনের বান্ধবদের মেরে পিঠের চামড়া খুলে জামা তৈরী করতে পারে তারা।

রবীন দেবযানীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে ট্রামে ওঠে খুব সাহস করে।

দেবযানীর সামনের সীটেই বসে। বেশ করবে বসবে।

দুবার তাকায় দেবযানীর দিকে।

দেবযানী একবারও তাকায় না।

কয়েকদিন কাটে। রবীন কিন্তু কিছুতেই দেবযানীকে মন থেকে সরাতে পারে না। অনেক চেষ্টা করেও পারে না। রাত্রে শুলে বরাবরই ওর এক মিনিটের ভেতর গভীর ঘুম এসে যেত। আজকাল একঘণ্টা চেষ্টা করে তবে হয়ত একটু ঘুম আসে।

বিছানায় গা দিলেই মনটা চলে যায় ওপরের ঘরে। কি করছে এখন দেবযানী কে জানে। হয়ত বই পড়ছে। নয়ত ভাবছে ট্রামের কথাটা।

দেবযানীর আয়ত চোখদুটো ওর চোখের সামনে ভাসে। চোখ বুঁজলেও।

বেশ ভাল লাগে ভাবতে।

মনে মনে কত ফন্দি বার করবার চেষ্টা করে রবীন। কি করে আলাপ করা যায়। আলাপই বা কি করবে। সে এম, এ, পাস। কত বড় বড় কথা বলে বসবে হয়ত। মূর্খ বলে ঘৃণা করবে তাকে। কিন্তু আলাপ না করতে পারলে যে কিছুতেই স্বস্তি পাবে না ও।

আবার পড়াশুনাটা সুরু করলে কেমন হয়। বছর কয়েকের ভেতর সে-ও ত' এম, এ, পাস করে ফেলতে পারে।

লজ্জা করে আবার স্কুলে ভর্তি হতে। অবশ্য বাড়ীতে পড়েও পরীক্ষা দেওয়া যায়।

চেষ্টা করতে ক্ষতি কি!

বই ত' আছেই ঝুমুরের। লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্তিরে না হয় পড়বে কালই আলাপ করা যায়।

কয়েকদিন আগেই ত' ট্রামের ভাড়াটা দিয়েছিল সে। ওর কাছে নোট ছিল। নোটের ভাঙ্গানী ছিল না কণ্ডাক্টরের কাছে।

ভাড়াটা চাইতে গেলে কেমন হয়!

ঘুম আর আসতে চায় না। ভাবনার পর ভাবনা এসে জোটে।

ভাবনাগুলো ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসতে আসতে হয়ত কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ে ও।

আজ বিকেলে বেরোবার আগে ও তাকালো একবার ওপরের দিকে তেমন সাড়া শব্দ ত' নেই।

বান্ধবরা আজ বোধ হয় হাজির নেই। যাবে নাকি একবার ওপরে ভাড়াটা চাইতে!

রবীন গট্ গট্ করে ওপরে ওঠে। যা থাকে বরাতে আজ।

ওপরে উঠে দেখে দেবযানী সেন বসে আছে। ঘরেই। মুখটা ওর একটা ম্যাগাজিনে ঢাকা। কোন ইংরেজী পত্রিকা।

রবীন ঢুকে পড়ে। অত সাহস মনে এলেও বুকটা ওর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে।

দেবযানী সেন শব্দ শুনে তাকায়।

রবীনকে দেখে যেন অবাক। ভাল করে তাকায় ওর দিকে।

রবীনের চোখদুটো নীচু হয়ে আসে। কানদুটো গরম হয়ে ওঠে।

—কি চাই তোমার?—মিহি স্বরে শুধোয় দেবযানী।

প্রথমেই তুমি।

রবীন কোনমতে বলে—সেদিনের ভাড়াটা।

—অ!—দেবযানী সেন ওঠে। ওর হাতব্যাগটা থেকে ছোট থলি বার করে ভাড়ার পয়সা কটা ওর হাত দিয়ে দেয়।

রবীনকে হাতে পেতে নিতে হয়।

দেবযানীর চুলের সুবাসে রবীনের পা আর সরে না। এক অপরূপ অনুভূতিতে ও বিহ্বল হয়ে গেছে যেন।

—আর কিছু বলবে? —স্বরটা ভারী মিষ্টি দেবযানীর।

অনেক কথাই ত' বলতে চায় রবীন। কিন্তু বলতে পাচ্ছে কই! মূর্খ ও। কি বলতে কি বলে ফেলবে। রবীন ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে দেবযানীকে। সাদা আঁট জামা গায়ে।

নিটোল হাত দুখানা দেখা যাচ্ছে শুধু। শুধু—শুধু হাত। হাত-ঘড়িটিও নেই। পরিষ্কার সীসের মত চিক্‌চিকে কাঁধের ওপর ওর খস্‌খসে চুল এলানো। পাউডার নেই, স্নো নেই, রঙ নেই, শুধু-শুধু মুখখানিতে যেন ভোরের নরম আলোর প্রলেপ। রবীন প্রথম পৃথিবীতে সুন্দর দেখল। এত সুন্দর!

রবীনের বিহবল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে মনে হাসলো দেবযানী সেন। মনে এল তার কিছু কৌতুক কিছু করুণা। ব্লকহেড্ ছেলেটাকে মেরেছে সে। বোধহয় একেবারেই মরেছে। আরও মিষ্টি করে বলে দেবযানী সেন আলতো একটু হেসে—আর কিছু বলবে?

রবীনের বুকটা ভরে যায় আনন্দে। এ আনন্দের স্বাদ ও এত বছর বয়েসে একদিনও পায়নি। এই প্রথম। বলে রবীন,—না কিছু নয়। বলছিলুম কি আপনি যদি আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হতেন।

—প্রেসিডেণ্ট! —ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো একটু উঁকি দেয় ঠোঁটের ফাঁকে। দেবযানী সেন হেসে ফেলে,—না, না, আমি প্রেসিডেণ্ট হবো কি করে? আর ত' কত লোক আছে।

রবীন বলতে যায়,—কই পাড়ায় আপনার মত আর—।

রবীনের ইচ্ছেটা ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হবার সূত্রে যদি আলাপের সুত্তোটা ধরে কাছাকাছি যাওয়া যায়

—না না, আমায় মাপ করো।

—বেশ, তবে না হয় ক্লাবের কাগজপত্র মাঝে মাঝে দেখিয়ে নিয়ে যাব আপনাকে। চিঠি পত্তর লেখাটেকাগুলো আপনি যদি একটু দেখেন—।

দেবযানী সেন ঘাড় নাড়ে।

অকারণে একটু হাসে রবীনের দিকে তাকিয়ে।

রবীনের বুকের ভেতরটা আঁকুপাঁকু করতে থাকে। বড় বড় নিশ্বাস নিয়েও যেন দম পায় না। কোনমতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

বেরিয়ে সোজা ক্লাবে।

ক্লাব ঘরে ঢুকে হাঁকে রবীন,—এ্যাই হুলো।

হুলোরাম বসে একা একা পেসেন্স খেলছিল।

উত্তর না পেয়ে রবীন একটা গাঁট্টা কসায়,—কিরে কানে ঢুকচে?

হুলোরাম ক্লাবের অবৈতনিক সেক্রেটারী। গাট্টাটা খেয়ে আঃ করে ওঠে।

—শোন এবার সরস্বতীপূজোর কবিতা-টবিতাগুলো সব একজনকে দিয়ে লেখাব। ফাইন লেখে মাইরী!

হুলো খুব উৎসাহিত হয় না। এককথায় সারে,—আচ্ছা সে হবে'খন।

রবীন আবার বলে, কাল যে বারাসাত ক্লাব থেকে চিঠিটা দিয়েচে, ওর উত্তর লিখেচিস?

—না।

—তবে দিস, চিঠিখানা আমায়। কেমন লিখিয়ে আনি দেখবি।

—দোব'খন।

রবীন হুলোর কাছ থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে একটু দমে যায়। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরায়। একটা বিড়ি ছুঁড়ে দেয় হুলোর দিকে।

—নে খা।

হুলো বিঁড়িটা তুলে নিয়ে ওর হাত থেকে আগুন নিয়ে এতক্ষণে বলে, —কাকে দিয়ে লেখাবি বলছিলিস্।

—সে আছে একজন। দে' দিকিনি চিঠিখানা।

হুলো ক্লাব ঘরের কুলুঙ্গি থেকে একটা ফাইল বার করে।

চিঠিখানা দেয় রবীনের হাতে।

রবীন চিঠিখানা পকেটে পোরে। আর একবার দেবযানীর সঙ্গে আলাপের পথ পাওয়া গেল। আরামে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে রবীন।

সেদিন সন্ধ্যার পর। ওপরের ঘর থেকে এক পুরুষ কণ্ঠের গান ভেসে আসে বাড়ীর সবায়ের কানে। রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভারী মিঠে গলায় গাইছে, দেবযানী সেনের কে একজন বান্ধব। আরও দু'একজন বান্ধবের গলা শোনা যাচ্ছিল আজ। তারপরই গান সুরু হোল।

—শুদ্ধ হৈ হুল্লোড়। কোনদিন নাচ সুরু হবে। হাটের মেয়েমানু-ষের মত করে তুললে!

টিপ্পনী কাটেন প্রমীলা দেবী।

ঝুমুর মুলো কুটচে, বলে—আজ কি শুধু ডাল আর মুলো?

—তবে না ত' কি পোলাও মাংস হবে?—ঝংকার তোলেন প্রমীলা দেবী,—এই-ই ত' তোর বাপ জোটাতে পারে না!

ঝুমুর প্রসংগটা পালটাতে চায়,—ওপরে কিন্তু মাংস লুচি হচ্ছে।

—কাদের ঘরে? শিশিরকণাদের?

—না, না, ও কোথা পাবে। দেবযানীদির ঘরে।

—তা হোক বাছা। আমাদের এমন নাচগান পোলাও মাংস দরকার নেই। মাথায় সিঁদুর নিয়ে যেন যেতে পারি মুলো ডাল খেয়ে।

ফুলমণি এসে দাঁড়ায় ওদের কাছে। ওপর থেকে নেমে এসেচে।

প্রমীলা দেবী তাকান,—ফুলমণি?

—হ্যাঁ মাসীমা, শুনচেন ত'?

ইঙ্গিতটা ওই গানকে লক্ষ্য করে।

মুখ টিপে হাসে ফুলমণি। দু চোখে দেখতে পারে না ঝুমুর ওর ফুলো ফুলো গালের বিচ্ছিরি হাসি। বলে, ওরা গাইচে ত' তোমার কি ভাই!

ফুলমণি প্রমীলা দেবীকে বলেন,—শুনলেন মাসীমা। আমি কি গায়ে পড়ে কথা বলচি ওর সঙ্গে।

প্রমীলা দেবী বলেন, বলচে ঠিকই ফুলমণি। কি ঢলাঢলি। দেখলে শুনলে গা জ্বলে!

ফুলমণি খাটো খাটো হাতখানা তুলে বলে, এর ওষুধ জানি মাসীমা। মুড়ো ঝাঁটা মারতে হয় মুখে। ঝুমুর উঠে যায় ওখান থেকে।

ফুলমণির সঙ্গে প্রমীলা দেবী কথার থলে খুলে বসেন।

ফুলমণিরও এ সবে ভারী আহ্লাদ।

ঝুমুর পড়বার ঘরে যায়। অন্ধকার পড়বার ঘরের জানালাটা দিয়ে এক টুকরো নীল আকাশ চোখে পড়ে ঝুমুরের। কি গভীর নীল আকাশ।

বাতাস আসে এক ঝলক। স্নায়ুগুলো শিরশির করে ওঠে। বুকের ভেতরটা ফাঁকা ঠেকে।

বসন্তের মন-ওড়ানো বাতাস।

গানের সুর ভেসে আসে ওপর থেকে।

কি মিষ্টি সন্ধ্যে। আর মধুমাখা সুর। তার চেয়েও মধুময় চূর্ণ ছড়িয়ে দেয় বাতাস!

ফুলমণি হিংসেতে তাই ছুটে এসেচে মায়ের কাছে বলতে দেবযানীর নামে।

হবেই ত'। এমন সন্ধ্যে! এমন মধু বৃথা কাটচে তাদের, মধুপানে প্রমত্তা দেবযানীকে দেখলে কার না হিংসে হবে।

ঝুমুরেরও ভাল লাগে না! বিমলদা' আজ এলো না কেন কে জানে? জানে দাদা বাড়ী নেই? তবু দাদাকে ডাকবার ছুতো করে আজ সন্ধ্যায় একবার আসতে নেই

এলে এবার বেরোবে না। পাঠাবে মা-কে। বুঝবে মজা।

এমন সন্ধ্যায় আসবে না। আসবে দুপুরের চাঁদি-ফাটা গরমে।

ঝুমুর ছট্‌ফট্‌ করে। বাতাসে রোমাঞ্চ লাগে। দূর ছাই! বন্ধ করে দিলে হয় জানালাটা। তার চেয়ে বরং বসে বসে বিমলদাকে একটা চিঠি লেখা যাক।

কতদিন ধরে বেচারী ওর চিঠির উত্তরটা চাইছে।' বিমলদার বোকা বোকা চোখ দুটো মনে পড়তেই ঝুমুরের কেমন মায়া হয় আজ। মানুষ বড় ভাল। বড্ড বেশী ভাল।

ঝুমুরের মনটা যেন বিমলের মনের কোন এক প্রান্ত ছুঁতে পারছে আজ।

বিমলের চিঠিখানা বাবার মামলার কাগজগুলোর ভেতর রেখেছে ঝুমুর—যেগুলো পড়ে আছে কাঠের বাক্সটার ওপর বহুদিন থেকে।

চিঠিখানা বার করে।

আলোটা জ্বালায়! কিন্তু নুপুর যদি এসে পড়ে?

নুপুর আসছে না কেন? আটটা বেজে গেল।

নিশ্চয়ই বড়লোকের ছেলেটার বাড়ী গান শিখতে গেছে। দু'একবার ত ছেলেটা এসেচেও ডাকতে, ঠিক দুপুরে যখন মা ঘুমিয়ে থাকে, বাবা দাদা থাকে না। ওরা দু'বোন হয়ত কোন কারণে বাড়ীতে থেকে যায়। ছেলে-টার চেহারাটা মন্দ নয়। বেশ ফর্সা। একটু বেশী চালাক বলে মনে হয়।

ওদের সঙ্গে নাকি পড়ে। মাঝে মাঝে নোটের খাতা পাঠিয়ে দেয় চাকর দিয়ে। কে জানে চিঠি থাকে কিনা। বিমল একটু কালো। তা হোক। চেহারাটা কত জোরালো। বীরের মত।

বিমলের চোখদুটো কত বড় বড় ভাসা ভাসা। তাকায়, যেন কিছু জানে না। কিছু বোঝে না। যেন একটুখানি কৃপা প্রার্থনা করছে। একটু হাসি একটু ছোঁয়া।

চিঠিখানা খোলে ঝুমুর।

কত সহজ লেখা। নাম ধাম নেই। শুধু কথা। প্রাণের গুটিকতক কথা।

আহা। কি মিঠে, এই জায়গাটা।

"ভাল লাগে। তাইত ভালবাসি। এতে অপরাধটা যে কোথায় ঠিক বুঝতে পারিনে। যদি অপরাধ নাও ত' ক্ষমা চাইব না। আমি জানি আমি অন্যায় কিছু করিনি। সংসারে ভালবাসতে পারাটা খুব বড় কথা। যে না পারে, সে আনন্দ কাকে বলে জানে না।"

কি পণ্ডিত! যে না পারে! কেই বা পারে না শুনি? পারলেই গলা বাড়িয়ে বলতে হবে, না বলা যায়! ঝুমুর মনে মনেই হাসে।

কথাগুলো কিন্তু ঠিকই। বিমল ভাবতে পারে খুব।

আবার লিখছে, "কত বছর ধরেই ত তোমায় দেখছি, কিন্তু এমন কোন ভাব কখনও মনে আসেনি যা তোমাকে বিশেষ করে বলতে হবে। কিন্তু তোমাকে একদিন দেখলাম। সন্ধ্যায় তোমাদের রোয়াকে বসেছিলে পা দুখানি মেলে। চুল বেঁধে কাঁচপোকার টিপ পরে বসেছিলে। বিকেলে গা ধুয়ে পরিষ্কার সাদা শাড়ীটি পরে কি সুন্দর যে তোমায় দেখাচ্ছিল, তা তুমি জানো না। বাড়িয়ে বলছি না, ঠিক একটি সদ্যফোটা শিশিরে ভেজা সাদা ফুলের মত দেখাচ্ছিল তোমায়।

আমি এলাম। ডাকলাম তোমার দাদাকে। তুমি তাকিয়ে একটু হাসলে, বললে বাড়ী নেই। ইচ্ছে হোল বলি, তুমি ত' আছো। দাওনা একটু পাশে বসবার জায়গা। একটুও কি জায়গা নেই তোমার পাশে? বলতে পারলাম না। তেমন সন্ধ্যা কি আর আসবে না জীবনে। তেমনি সুন্দর কি পাশে বসে কখনও দেখতে পাবো না?"

সুন্দর না ছাই! যত সব বাড়িয়ে-বলা!

ঝুমুরের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

কই কেউ ত' তাকে সুন্দর বলে না! রঙ কালো, রোগা। রূপ আবার কি ছাই আছে? কই এমন করে সুন্দর তাকে ত' কেউ কখনও বলেনি!

ঝুমুরকে সুন্দর দেখেছে প্রথম একটি পুরুষ। ভাবতেও রোমাঞ্চ হয় ঝুমুরের।

চিঠিটার উত্তর ঝুমুর দেয়নি। কতদিন বিমলদা' এসে দাদাকে ডেকেছে। সে গিয়ে বলেছে, বাড়ী নেই। বাড়ী নেই জেনেই এসেছে বিমল।

শুধু বলেছে, উত্তরটা?

ঝুমুর প্রায় ছুটে পালিয়ে এসেছে।

প্রথম যেদিন চিঠিটা দেয় বিমল। বিকেল তিনটে নাগাদ। তখনও দাদা ফেরেনি।

বিমলদা ডাকলো। সে যথারীতি বাড়ী নেই বললে।

বিমল টুক করে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে তার হাতে দিলে। সে ভাবলে দাদার চিঠি বুঝি।

যাবার সময় বিমল বলল,—এটা তোমার। পড়বে।

ঝুমুরের বুকটার ভেতর ধুক্ ধুক্ করে উঠলো।

চিঠি! ভয়ে হাতটা কাঁপছিলো। কি অসব্য বিমলদা। কেউ যদি দেখে ফেলত!

ঘরের কাছে এসে ব্লাউজের ভেতর চিঠিখানা পুরে ঝুমুর ঘরে ঢোকে। তারপর চিঠি কোথায় বসে পড়বে তাই এক সমস্যা।

পরদিন ভোরে উঠে পড়বে ভাবে। কিন্তু ভোরবেলা উঠে দেখে নুপুর চোখ পিট্ পিট্ করছে পাশে শুয়ে। ঝুমুর উঠতেই নুপুর বলে—কিরে এত ভোরে উঠছিস্?

ঝুমুর একটু হকচকিয়ে বলে, শরীর ম্যাজ্ ম্যাজ্ করচে।

—শরীর খারাপ ত' শুয়ে থাক না?

—না, একটু উঠে বেড়াই। —বলে বেরোয় ঝুমুর।

সকালে পড়া হোল না।

দুপুরে সেদিন ইস্কুল কামাই করে ঝুমুর।

নুপুর কলেজে যায়। মা ঘুমোয়। সেই ফাঁকে চিঠিখানা পড়ে ফেলে ঝুমুর।

তারপর থেকে বিমলের তাগাদা, উত্তর কই?

উত্তর আবার কি দেবে? বিমল কি জানে না উত্তর কি!

আজ বসে বসে লেখবার চেষ্টা করে ঝুমুর। বেচারী অনেকদিন থেকে উত্তর চাইছে।

কি লিখবে ভেবে পায় না।

লিখবে, 'তোমাকে আমি—'

ধেৎ! ঝুমুর কিছুতেই লিখতে পারবে না এ কথা।

তবে কি লিখবে?

'আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই সত্য।'

কি আবার ভেবেছ। কিছুই ত' ভাবেনি বিমল।

তবে না হয় লেখা যাক্, 'আমারও আপনাকে ভাল লাগে সে কথা কি জানেন না ?'

দূর ছাই। বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে। অত কাটা কাটা কথা লেখা। একটু রেখে ঢেকে কি লেখা যায়না।

না। তার দ্বারা লেখা আর হবে না দেখছি।

বসে বসে কতক্ষণ সময় কেটে যায় ঝুমুরের।

দোরের সামনে জুতোর শব্দ পেয়ে চমকে চিঠিখানা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলে ঝুমুর।

নুপুর এসেছে, ঘরে ঢোকে নুপুর।

মুখখানা ওর হাসিতে ভরা।

বইখাতা রাখতে রাখতে শুধোয়,—কি কচ্ছিস রে ?

—কি আর কোরব।

—মা আমার কথা কিছু বলছিলো ?

—না ত'।

নিজের মনেই কৈফিয়ৎ দেয় নুপুর,—কি কোরব ভাই। দেরী হয়ে গেল। গিয়েছিলাম গান শিখতে।

—কোথায় ?

—ওই যে খুব ভাল গান গায়, তার কাছে। কি মিষ্টি সুরটা। শোনাব শুয়ে শুয়ে তোকে।

ঝুমুর বোঝে গায়িকটি কে, তবু শুধোয়, কে ভাল গান গায় রে ?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে নুপুর, তুই চিনবিনে।

এর ভেতরেই বিমলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়,—রবীন আছে ?

নুপুর যেন বিরক্ত হয়ে, বলে, ওই ছেলেটা এসেচে। যা বিদেয় করে আয়।

না বললেও ঝুমুর যেত। তবু গা আড়মোড়া ভেঙে বলে,—যত লোক ডাকতে আসবে, বিদেয় করতে হবে আমায়। বলে দোরগোড়ায় গিয়ে একটু জো রে গলায় বলে,—দাদা বাড়ী নেই।

আজও বলে বিমল ঝুমুরকে দেখে, কই উত্তর পাব না ?

আজ আর ঝুমুর এড়িয়ে যায় না। বুক কাঁপে তবু ফিস্ ফিস্ করে বলে, কি উত্তর চান ?

—যা তোমার মন বলে।

—আমার মন কিছু বলে না। আমি কিছু জানি না।

ওর কথায় বিমলের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে।

—কিছু বলবার নেই ?

ঝুমুরও যেন অভিমানে কেঁপে ওঠে। ও কি কিছু বোঝে না। এত বোকা !

স্পষ্ট স্বরে বলে,—না, কিছু বলবার নেই।

বিমল আর একটা কথাও বলে না। চলে যায়।

ঝুমুর দাঁড়িয়ে থাকে একটু সময়। কানদুটো ওর জ্বালা করে। ঠোঁট শুকিয়ে আসে। ও জানে যে হয়ত বিমল আর আসবে না। তবু এ ছাড়া আর কিই বা বলতে পারে ঝুমুর। কি যেন কেন ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। বুকের ভেতর কথার বুদ্বুদ উঠে আবার মিলিয়ে গেল। বলতে পেলো না ঝুমুর। সংসারে কি সব কথাই মুখে বলতে হবে ? না বললে কি কোন কোন কথা বোঝা যায় না। পুরুষ মানুষ কি বোকা !

বিশুষ্ক মুখে ঘরে ফিরে আসে ঝুমুর। এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে রান্নাঘরের দিকে যায় মায়ের কাছে।

—তোর পড়া নেই ? শুধোন প্রমীলা।

—আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না মা। তোমার কি কাজ করতে হবে বলো ?

ঝুমুর মায়ের পাশে বসে যেন একটু স্বস্তি পায়।

হাত মুখ ধুয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে পড়বার ঘরে আসে নুপুর। দোরের দিকে একবার তাকায়। পাশের একফালি দালানে বাবা ঘুমোচ্ছে। মা আর ঝুমুর রান্নাঘরে। আংটিটা বার করে হাত-ব্যাগ থেকে নুপুর। আজ পেয়েছে ও এই আংটি। সুবীর দিয়েছে আজ ওকে। সুবীরদের বাড়ী আজ ওর চায়ের নেমন্তন্ন ছিলো। আলাদা ঘর সুবীরের। বিরাট প্রাসাদের পূর্বদিকে ঘরখানা। নুপুরের কেমন ভয় ভয় করছিলো।

সুবীর ডাকলে, আসুন ভেতরে। নুপুর ঘরে ঢুকলো। ঘর দেখে নুপুরের চোখে ধাঁধা লেগে যাবার জোগাড়। কাঁচের টেবিল, প্রায় একহাত মোটা গদি-মোড়া বসবার আসন। শোবার খাটটি কি সুন্দর, ছোট আর পরিচ্ছন্ন। থাকে থাকে বই সাজানো দেয়াল আলমারীতে। এক কোণে একটি মস্ত বড় কমণ্ডলু। তার ওপর এক গুচ্ছ গন্ধরাজ আর গোলাপ। অনেকগুলো ধবধবে জামা কাপড় ছড়ান খাটের উপর। বোধহয় সবে ধোপার বাড়ী থেকে এসেছে। নুপুরের ইচ্ছে হোল খুব খুঁটিয়ে সব দেখে। কিন্তু সুবীর কি ভাববে এই লজ্জায় ও চোখ তুলতে পারলো না ভাল করে।

সুবীর আসন দেখিয়ে বলে,—বসুন।

চাকরকে ডেকে চা আনতে বলে।

নুপুর সহজ হবার চেষ্টা করে, একটা গান কিন্তু আজ শুনবই।

সুবীর হাসে, আচ্ছা সে হবে।

নুপুর বইগুলোর দিকে তাকায়, এত বই আপনার ?

—সব কি আর পড়েছি। কিনেছি, তেমনিই পড়ে আছে। আপনি নিন না, নেবেন ?

—আজ থাক।

আবার দুজনে চুপচাপ।

নুপুরের বুকটা কাঁপে। সুবীরের চোখদুটো ছুরির ফলার মত ঝকুঝক্ করে ওঠে।

একটু নাটকীয়ভাবেই যেন হঠাৎ হেসে ওঠে।

—হাসলেন যে ? শুধোয় নুপুর।

—একটা কথা ভেবে।

—কি বলুন না। —নুপুরের কৌতূহল দেখাতে হয়।

—শুনলে যদি রাগ না করেন বলি।

—আমার রাগ করবার কি আছে। বলুন না।—তবু বুকটা দুরুদুরু কাঁপে নুপুরের।

সুবীরের চোখের এক অস্বাভাবিক জ্বালাময় দৃষ্টি নুপুরকে বিদ্ধ করে অসহায়া হরিণীর মত।

সুবীর বলে,—কতদিন এই ঘরে বসে বসে ভেবেছি, আপনাকে এ ঘরে আনতেই হবে। কবে আনতে পারবো। আজ সত্যিই আপনি এলেন তাই হাসচি। বিশ্বাস করলেন ত' ?

নুপুর যেন বোকা হয়ে যায়। চোখদুটো ঝিমিয়ে আসে আনন্দের মোহে।

সুবীর টুক করে এগিয়ে আসে।

গলার স্বরটি কি গভীর আর উদাস। কি সুন্দর কথা বলে সুবীর। —অনেক রাত ভোর হয়ে গেছে আপনার কথা ভেবে। বিশ্বাস করেন ?

এক ঝলক বাতাস এসে গায়ে যেন একমুঠো আনন্দ ছড়িয়ে দেয়।

শিউরে ওঠে নুপুর।

বসন্তের অবশ করা বাতাস।

সুবীরের নেশা লাগে।

একটা সিগারেট ধরায় সুবীর। দামী সিগারেট।

সিগারেট টানলে সুবীরকে কি সুন্দর দেখায়।

নির্নিমেষে চোখে এতক্ষণে সুবীরের দিকে তাকাতে পারে নুপুর।

আস্তে আস্তে বলে,—বিশ্বাস করি।

চাকর এসে চা রেখে যায়।

আবার দুজনে সহজ হয়ে ওঠে। চা, বিস্কুট, সিগারেট, কলেজের নোট, ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ষ্ট্রাইক। অনেক আলাপ, অনেক কথা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে যায়।

—কই একটা গান শোনালেন না?—সাধে নুপুর।

সুবীর শুধু গলায় গান ধরে। রবি ঠাকুরের গান।

এত আস্তে অথচ এত গভীর সুর। সুবীরের গলায় কি যাদু! রেডিওতে ত' মাঝে মাঝেই গাইছে সুবীর আজকাল। শিগ্গিরই রেকর্ড হবে।

কত গুণ। কত সুন্দর।

নুপুর যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে।

গান থেমে যায়।

কথাও থেমে যায়।

আবার বসন্তের ঝিরঝিরে বাতাস। শুধু শিহরণ।

—আজ তাহলে আসি।—উঠতে যায় নুপুর। অনেক রাত হোল।

সুবীর বলে, আবার আসবেন কিনা জানিনে। আজকের সন্ধ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই আপনার মনে একটি সামান্য উপহার দিয়ে। নেবেন?

কিছুই বলতে পারে না নুপুর। একটু হাসে।

একটা হালকা ছোট আংটি দেয় সুবীর। মস্ত বড় একটা লাল পাথর বসানো।

হাতে দিয়ে বলে, পরিয়ে দেবার সাহস পেলাম না, মাপ করবেন। আপনি পরুন।

পরিয়ে দিলে ত খুসীই হতাম—কিছুতেই বলতে পারল না নুপুর।

সেই আংটিটিই পড়বার ঘরে বসে দেখছে নুপুর। আর ভাবছে। ভাবনার সমুদ্র যেন। ভাবতে যে এত ভাল লাগে এর আগে কে জানত! নুপুর নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে এসেছে আজ। ভারী হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। পালকের মত। আরামে চোখ বুজে আসে নুপুরের। আংটিটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

শিশিরকণার আজ মন বড়ই খারাপ। সমস্ত দিন দাঁতে কুটো কাটেনি। আজ প্রায় বারোদিন কেটে গেল একখানাও চিঠি আসেনি। চিঠি লেখেনি মধুসূদন। বুড়ীরও বোধহয় মেজাজটা ভাল ছিল না। মধুর চিঠি আসেনি। খোঁজখবর নেই। অসুখ-বিসুখ হোল, না মরে গেল। বুড়ীর বুকটা কেঁপে ওঠে।

কাল রাত্রেই ত' শিশিরকণাকে বলেচে বিড় বিড় করে,—চিঠিপত্তর কি এসেচে কিছু ?

ইংগিতটা শিশিরকণা বোঝে, মানে সে চিঠি কিছু লুকিয়েছে কিনা।

শিশিরকণা একটু ঝামটা না দিয়ে পারে না,—এলে ত' জানতেই পারতেন।

বুড়ী অতি ভালমানুষ হয়ে যায় যেন,—না ওমনি শুধোচ্ছিলুম, বলি যদি এসে থাকে হয়ত মনে নেই তোমার !

—চিঠি এলে আবার কারো মনে থাকে না, কি যে বেআক্কেলে কথা বলেন !

বুড়ী তবু রাগে না,—রাগ কোচ্ছ কেন বৌমা! ভাবচি মধুর কোন অসুক-বিসুক হোল, না কি হোল—।

শিশিরকণার ভাল লাগে না বকবকানি,—হোল ত' হোল।

বুড়ী আনমনেই বলে,—তোমার মন থেকে কি বলচে ?

—কিছুই না।

—আমার কিন্তু মনে হয়, কিছু হয়েচে ওর।

জবাব দেয় না শিশিরকণা।

বুড়ীর বিড়বিড়ানি কমে না,—আচ্ছা হোথা থেকে চিঠি আসতে কদিন লাগে?

শিশিরকণার মন একটু ভেজে, বলে,—দিন দুয়েক। অবিশ্যি ঠিক নেই কিছু। দিন সাতেকও লাগে দেখিচি।

—সে কতদূর বৌমা?

—অনেক দূর মা। কত হাজার হাজার মাইল!—শিশিরকণার এতক্ষণে যেন ভাল লাগে বুড়ীর কথাগুলো। আহা এত ব্যস্ত হবে নাই বা কেন, একমাত্র ছেলে! শিশিরকণা আর উনি ছাড়া আর বুড়ীর কেই বা আছে!

মনটা যেন বুড়ীর জন্যে কেমন করে এখন।

শুধোয়, আপনার কি ঘুম হচ্ছেনা?

—না, বৌমা! মাথাটা কেমন ধারা বোঁ বোঁ করচে।

উঠে বসে শিশিরকণা,—কপালটা টিপে দিই ঘুমোন।

বুড়ীর কপাল আস্তে আস্তে টিপে দেয় শিশিরকণা।

বুড়ী বলতে থাকে, মরলেই বাঁচি বৌমা। আর ভাল লাগে না।

—আহা, ওকি কথা! বলে ওঠে শিশিরকণা।

বুড়ী বলে,—মধুর কি একটু মায়াও নেই গা। বুড়ো মা ভাববে ওর কথা,—এটাও কি মনে থাকে না?

—ওই ওমনি ধারা মানুষ! বলে শিশিরকণা। কিন্তু সে ত' জানে তার আগের চিঠিখানা পেয়েই বোধহয় চিঠি লেখা বন্ধ করেছে ও।

আগের চিঠিতে লিখেছিলো সে, 'তোমার মা আমাকে জ্বালাইয়া মারিতেছে। তোমার চিঠিও লুকাইয়া রাখে, খুলিয়া পড়ে। ইহার

বিহিত না করিলে চিরজীবনে আমার চিঠি আর পাইবে না। মানুষের সহ্যের সীমা আছে। তাহাও ছাড়াইয়া যাইতেছে।'

এ চিঠির পর চিঠি লেখা বন্ধ করা ত' অস্বাভাবিক নয়।

তাই হয়ত করেছে।

তখন রাগের মাথায় কথাগুলো না লিখলেই ভালো হোত।

বৃদ্ধাও ঠিক কথাই ভাবছে, রাগের মাথায় সেদিন পোষ্টকার্ডে নীচের ঝুমুরকে দিয়ে কথাগুলো না লেখালেই ভাল হোত।

বুড়ী সেদিন শিশিরকণার সঙ্গে চিঠি নিয়ে ঝগড়া করে পোষ্টকার্ড লিখেছিলো ছেলেকে নীচের ঝুমুরকে দিয়ে।

লেখো ত' মা, 'বাবা মধু, বধূমাতার ব্যাভার আর অত্যেচারে আমি তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না জানিবা। যখন তখন যাহা নয় তাহা বলিতেছে জানিবা। তুমি একবার নিজে চক্ষে আসিয়া তোমার চিরদুঃখিনী মাকে দেখিয়া যাও। বিস্তারিত লিখিলাম। যাহা ভাল মনে হয় করিবা।' ঝুমুর খস্ খস্ করে লিখেছে সব কথা।

কিছু কথা কেটে দিলেই ত' পারত মেয়েটা। আমিই না হয় রাগের মাথায় বলেছি, তাই বলে অমন লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে লিখে দিলে। বলতে হবে কাল ঝুমুরকে।

বুড়ীর রাগটা গিয়ে পড়ে ঝুমুরের ওপর। কেমনধারা বেআক্কেল গো! বুড়োমানুষ রাগের মাথায় না হয় বলেইচে দু'টা কথা, তাই বলে কথাগুলো ফস্ ফস্ লিখে দিলে!

ও চিঠি পাবার পর কি আর মধু উত্তর দেবে, তার দোষেই হয়েছে এমন কাণ্ডটা।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় শিশিরকণা। বুড়ী ঘুমিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।

ঝগড়াটা হোল পরদিন ভোরে।

বুড়ী ঘুম থেকে উঠে দেখে শিশিরকণা ঘুমোচ্ছে। ডাকে,—ও বৌমা, ওঠো।

অনেকরাত পর্যন্ত জেগে শিশিরকণা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। সকালে উঠতে ইচ্ছেও হচ্ছিল না। শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছিল। ভাল লাগছিলো না চোখ মেলতে।

বুড়ী আবার ডাকে,—রোদ মাথায় উঠে এলো। উঠবে না?

ঝাম্‌টা দেয় শিশিরকণা,—না। উঠব না।

—তা' আর উঠবে কেন? অলক্ষী লাগিয়ে ছাড়লে।

শিশিরকণার আর সহ্য হয় না। সকালেই গালাগালি সুরু হোল দেখে ওর মেজাজটা অষ্টমে পৌছোল।

—আমার খুসী আমি উঠবো না। সারাদিন ঘুমোব।

—আ মরণ! তেজ দেখাবার আর জায়গা পাওনি।

—আপনিও ত' তেজ কম দেখাচ্ছেন না। ছেলেকে ত' মারবার জোগাড় করেছেন। আমাকেও না হয় গলা টিপে মেরে ফেলুন।

বুড়ী খেপে ওঠে,—আমি ছেলেকে মারছি। এত বড় আস্পদ্দা! তুই মারছিস হতচ্ছাড়ী ডাইনী!

শিশিরকণা বিছানায় লাফিয়ে ওঠে' যা তা গালাগালি করবেন না বলচি। ভাল হবে না বলচি।

—কি করবি তুই? তোর চোদ্দপুরুষকে ডেকে নে' আয়!

শিশিরকণার চোখ ফেটে জল বোরোয়,—বাপ মা তুলে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। বুড়ী হাবড়া মরেও না। মরলে বাঁচি।

—তুই মর। পাঁচ পয়সা হরির লুট দোব। ভগবান কি চোখে দেখচে না সব?

—সবই দেখচে। ভগবান যদি থাকে, বিচার করবে।

—করবে লো করবে। ভাল করেই করবে। পচে গলে মরবি। মুকে জল দেবে না কেউ!

—বুড়ী দূর হলে বাঁচি। দূর দূর। শাশুড়ী নয়ত রাক্ষসী!

বুড়ী তেড়ে আসে,—কি, রাক্ষসী বললি আমায়!

—বেশ করিচি বলেচি। আরও বোলব।

শাশুড়ী বউয়ের চীৎকারে বাড়ীর সবাই জেগে যায়। প্রমীলা দেবী টিপ্পনি কাটেন,—এই লেপেচে বৌটার সঙ্গে! জ্বালালে বাপু! দিন রাত্তির কিচিরমিচির।

দেবযানী সেন মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বলে আপন মনে, যত সব ইডিয়ট আনকালচারড্! এ বাড়ীটা ছাড়তেই হবে!

মালতী ইসারা করে বাসুদেবকে। লেগেচে আজ।

বাসুদেব বলে,—যাও না একবার।

মালতী বলে, বৌটাকে মেরেই ফেলবে!

বাসুদেব হাসে, দোষ বুড়ীরও খুব বেশী নেই। দোষ সবটাই মনের আর মনের কতকগুলো অস্বাভাবিক বিকারের। দু জনেই ওরা জানে না ওরা কি করছে।

—মনোবিশ্লেষণ থামাও।

—বিশ্লেষণ নয়। এটা সংসারের সত্য।

মালতী চায়ের কাপটা রেখে বলে,—ঝগড়াটা থামুক তারপর যাব। আগুনের মুখে এখন যাব না।

সবচেয়ে বেশী বিচলিত হয় সমরেন। ধীরেনবাবুর ভাই।

ফুলমণি উনুনে আঁচ দিচ্ছিল। ওকে এসে বলে, একবার গিয়ে ছাখ না। বৌটাকে কি গালাগালি করচে। বোধহয় মারচেও।

ফুলমণি উনুনে বাতাস করতে করতেই বলে, পারব না আমি। তোমার যদি দরদ থাকে তুমি যাও।

সমরেন ওর ধমকটা একটু সামলে নেয়, বলে,—না, এমনিই বলছিলুম। একটা অনাথা মেয়েছেলের ওপর অত্যেচার—! তুইই বলনা, সওয়া যায়?

—খুব সওয়া যায়। নিজের লোকের অত্যেচার ত' কতই সইতে হচ্ছে। বলে ফুলমণি সমরেনের দিকে তাকিয়ে একটু ফিক করে হাসে, আচ্ছা তোমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন বলো ত'।

সমরেন জবাব দেয় না। চলে যেতে চায়। ফুলমণির এই হাসিটা দেখলে সমরেনের গা জ্বালা করে। কেন যে সমরেন ঠিক বোঝেও না। ফুলমণির কিছুমাত্র মিষ্টিকথা, হাসি, আদর ও সইতে পারে না। শরীরের ভেতরটা কেমন যেন শির শির করে ওঠে রাগে বিরক্তিতে।

ফুলমণিকে ত' কতদিন ধমকে উঠেছে।

একদিনের কথা সমরেনের বেশ মনে আছে। তখন ফুলমণি নোতুন এসেছে। বৌদি মারা যাবার পর প্রথম দিন থেকেই সমরেনের ভাল লাগেনি মেয়েটিকে। কোথাকার গেঁয়ো ভূত! চুলের তেল বেয়ে বেয়ে পড়চে কপাল দিয়ে। সোজা সিঁথির ফাঁকে ময়লা দেখা যায়। হুতকো মত মোটা তেলা-তেলা চেহারা। চোখদুটো ছোট ছোট দুটো আলুর মত।

সমরেন কলকাতার ছেলে।

ওর গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

ফুলমণি কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সমরেনের কাছাকাছি থাকতে চায়। পাশে পাশে ঘেঁসতে চায়, গল্প করতে চায়। সমরেন ভাল করে কথাও বলে না। উত্তরে দু একটা হুঁ হাঁ করে মাত্র। হয়ত ফুলমণি বললে,—দেখেচো, কেমন সাড়ীখানা এনেচে ধীরেনবাবু।

ধীরেনবাবু যে মাঝে মাঝে এটা ওটা ফুলমণিকে দেয় সমরেন জানে। ফুলমণির ওপর দাদার অকারণ টানটা বেশ টের পায় সমরেন।

বলে, দেখি।

গোলাপী রঙের সাড়ীখানা বার করে ওকে দেখায় ফুলমণি।

সমরেন ব্যঙ্গ করে বলে, যেমন দাদার পছন্দ, তেমনি তোকে মানাবে!

ফুলমণি প্রথমটা ঠিক বোঝে না। বলে,—ভাল মানাবে না?

সমরেন মুচকী হেসে বলে,—খুব মানাবে। টিকেয় আগুন ধরবে।

ফুলমণি যে কালো, সেই ইংগিতটা এবার ফুলমণি পরিষ্কার বোঝে। মুখখানা ওর বেগুনী রঙ হয়ে ওঠে যেন।

গলাটা ধরে যায়। আর কিছু না বলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সমরেন বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রেডিওর দোকানের ডিউটিতে।

ফুলমণি রান্নাঘরে গিয়ে চোখ মোছে বারে বারে। সে কালো, সে কুচ্ছিত! তাই বলে তার কি এতটুকুও ভাল কিছু দেখতে পায় না সমরেন।

সন্ধ্যায় ধীরেনবাবু কাজ থেকে ফিরলে তাকে জলখাবার দিয়ে বলে ফুলমণি, কি বিচ্ছিরি সাড়ী দিয়েছেন আপনি। আমায় মোটে মানায় না। কি পছন্দ আপনার!

ধীরেনবাবুর ভাঙ্গা গালের ওপরে কোটরাগত চোখদুটো বিস্ফারিত,—কে বললে মানায় না।

—ছাই সাড়ী। ও আমি পরতে চাই না।

ধীরেনবাবু এ মাসের খরচা থেকে বহুকষ্টে টাকা বাঁচিয়ে সাড়ীটি এনেছে ওকে খুসী করতে। তাই বড় নিরাশ হয়ে পড়ে। মস্ত ছাপাখানার ঝানু কম্পোজিটর ধীরেনবাবু। তার পছন্দ নেই? বললেই হোল অমনি। কত নেমন্তন্ন পত্তরের ফুলের বর্ডার, বিয়ের পদ্যের

ডিজাইন তার পছন্দে হচ্ছে, আর সামান্য একখানা সাড়ী। চশমার সুতোটা কান থেকে খুলতে খুলতে বলে,—হঠাৎ অমন পিতিজ্ঞে করে বসিস নি। তোর দিদিকে কত সাড়ী দিইচি, বলুক দিকি কেউ তাকে কেমন না মানিয়েছে। বললেই হোল অমনি। ও সাড়ী পরলে তোকে পটের মত মানাবে।

—হাতী মানাবে।

—কে বলেছে মানাবে না!

—আপনার ভাই ত' ঠাট্টা করে গেল। বলে টিকেয় আগুন ধরবে।

ধীরেনবাবু অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। সমরেনের কথায় ফুলমণির আস্থা, সমরেনের ওপর অহেতুক টান পছন্দ করে না ধীরেনবাবু।

বলে,—ও রাসকেল কি জানে? ওই গাধার কথায় রাগ করলি তুই? আসুক আজ সমরা জুতিয়ে লম্বা করে দোব।

ফুলমণি বলে,—থাক্ আপনার আর লম্বা করতে হবে না।

—ওর কথা কেন ধরিস। বলিস ত' বার করে দিই বাড়ী থেকে। বড় তেল বেড়ে গেছে ওর।

ফুলমণি যেন চটে,—ভাইকে কেন বার করতে যাবেন। বার করতে হয় তো আমায় করুন

ধীরেনবাবু ফুলমণিকে আর চটাতে চায় না।

বউটা মরবার পর ফুলমণির মুখখানা দেখেই বেঁচে আছে ধীরেনবাবু। ও চলে গেলে ধীরেনবাবুর ঘর যে শ্মশান হয়ে যাবে।

ধীরেনবাবু কথা বাড়ায় না।

ফুলমণিও চলে যায় রান্নাঘরে। দু'হাতে কেবলই চোখ মোছে। সমরেন কেন যে ওকে দেখতে পারে না দুচোখে ও বুঝে উঠতে পারে না।

এরপর আর একদিন।

ফুলমণি ওর জমানো পয়সা থেকে একটা আম কিনেছিলো।

আমটা ধীরেনবাবুকে লুকিয়ে রেখে পরদিন বিকেলে সমরেন বেরোবার আগে নিয়ে গেল ওর কাছে।

সমরেন চুলটা আঁচড়াচ্ছিল উল্টে খুব মসৃণ করে। কিন্তু কিছুতেই মনোমত ঝক্‌ঝকে মসৃণ হয়ে উঠছে না।

ফুলমণি আসে।

—এই আমটা খেয়ে যাও।

সমরেন একটু বিরক্ত হয়। চুলেই ওর মনোযোগ। ফুলমণির কথার উত্তর দেয় না।

আবার ফুলমণি বলে,—আমটা দোব কেটে?

—কে এনেচে? এখন ত' আমের অনেক দাম।

ফুলমণি আস্তে আস্তে বলে,—আমিই এনেচি। গঙ্গা নাইতে গেছলুম নিয়ে এসেচি।

সমরেনের গা জ্বলে যায় যেন,—দাদাকে দিও।

—তোমায় একটু দিই।

—দাও। —বলে সমরেন ওর হাত থেকে আমটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়। রাগে শরীর জ্বলে যায় সমরেনের।

যত চেষ্টা করে সে এড়াতে, ততই যে জোঁকের মত চেপে ধরতে চায় যত ছেঁড়া ঝঞ্ঝাট!

ফুলমণি প্রথমটা বিস্মিত হয়ে যায়।

ও ধারণাই করতে পারেনি যে আমটা রাস্তায় ফেলে দেবে হঠাৎ।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আর কথা বলে না ফুলমণি। বেরিয়ে আসে।

রান্নাঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে বোকা গেঁয়ো ফুলমণি।

সমরেন একটু পরে বোঝে কাজটা যেন একটু অন্যায় হয়ে গেল। একটু মায়াও যেন হয় মেয়েটার জন্যে।

তবু আজও সমরেন ওর আদুরেপনা আর মুচকী হাসি সইতে পারে না। গায়ের ভেতর রী রী করে ওঠে। আজও শিশিরকণার গঞ্জনায় সমরেন যখন ব্যস্ত হয়ে এলো ফুলমণির কাছে ফুলমণি দু'কথা ঠেঁস দিয়ে শোনাতে ছাড়লে না। প্রথম প্রথম ফুলমণি বোকার মত অনেক কেঁদেছে কিন্তু এখন দু'বছর কলকাতায় থেকে সহরের যান্ত্রিক ভাবধারাটার সঙ্গে ওর কঠিন পরিচয় হয়ে গেছে। সমরেনকে এখন সুযোগ পেলেই দু'কথা শোনায়।

সকালে আর সমরেন কিছু বলে না। দুপুরে খেতে এসে শুধোয় ফুলমণিকে,—হ্যাঁরে, ওদের বউটা রান্না করেছিল ?

—না।

—তবে কি খেলো ?

—খায়নি কিছু। সেই ঝগড়ার পর থেকে পড়ে আছে ঘরে। বুড়ী নিজে ভাতে ভাত করে খেয়েছে। শাউড়ীরও আক্কেলের বলিহারী যাই।

—যা বলেচিস। —সায় দেয় সমরেন।

খেতে খেতে বলে,—বাঃ! ল্যাটামাছের ঝোলটা ভারী খাসা হয়েছে খেতে।

ফুলমণির রান্নার প্রশংসা করে ওকে খুসী করতে চায় সমরেন।

ফুলমণি সত্যিই খুসী হয়,—আর একটু দোব ?

—দে।

ল্যাঠামাছের ঝোল খেয়ে এবার বলে সমরেন,—বউটাকে ডেকে নিয়ে আয় না, বরং এখানেই আজ খাক্। দই এনে দিই দু'আনা।

ফুলমণি বলে,—সে কি খাবে আমাদের ঘরে ?

—যা না ছাখনা একবার বলে।

অগত্যা ফুলমণিকে একবার যেতে হয় শিশিরকণার ঘরে।

শিশিরকণা শুয়ে পড়েছিলো। ফুলমণি গিয়ে ঠেলে,—ও বৌদি! বৌদি গো!

—কে রে? —তাকায় শিশিরকণা।

দোরের পাশে দাঁড়িয়ে বিঁড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কান পেতে থাকে সমরেন। শিশিরকণার গলাটা ত তবু শুনতে পাবে। শিশিরকণার কথাও বড় মিষ্টি লাগে সমরেনের।

ফুলমণি বলে,—শাউড়ী কোথা ?

—যমের বাড়ী। —বলে শিশিরকণা ঝাঁজ নিয়ে।

ফুলমণি মুখ টিপে হাসে,—তা না হয় যাক। কিন্তু তুমিও যে না খেয়ে মরতে বসেছ।

শিশিকণা বিরক্ত হয়,—তুমি আবার জ্বালাতে এলে কেন ?

ফুলমণি শুধোয়,—রান্না কি হয়নি ? কি খাবে ?

—আঃ মরতে এখানে এলে কেন, আর জায়গা পেলে না গা!

তবু বলে ফুলমণি,—ওঠো। আমাদের ঘরেই না হয় দুটিখানি মুখে দিলে। আমারা ত' আর মুচি ডোম নই গো ?

শিশিরকণা চুপ করে থাকে।

ফুলমণি ভাবে হয়ত সম্মতি আছে।

জোরে টেনে ওঠাতে যায় ওকে।

শিশিরকণা ওকে ধাক্কা মারে রেগে। ফুলমণি ছিট্‌কে পড়ে, মাগো!

—বের হও দূর হও এঘর থেকে।

এ কথার পর ফুলমণি আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না,—ভাল

বুঝে এলুম, গাজোয়ারী দেখাচ্ছে গা! গায়ের অত জোর হয়ে থাকে ত' শাউড়ীকে ধরে ঠেঙাও। পরের ওপর জোরাজুরী!

শিশিরকণাও বলে,—কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিলো আসতে।

—কেউ বলেনি গা। এসেছি ঘাট হয়েছে। আর কোনদিন আসব না এই পিতিজ্ঞে করে গেলুম।

ছম্ ছম্ করে বেরিয়ে আসে ফুলমণি।

সমরেন সরে যায় দোরের আড়াল থেকে।

ফুলমণি রান্নাঘরে আসে।

সমরেনও আসে রান্নাঘরে। বলে,—কি হোল? কি বললে?

—ছোটলোক। ওর কাছে আবার মানুষ যায়?

—তুই গালাগালি করেচিস?

—করেচিই ত' একশ বার কোরব। হাজারবার কোরব।

—তুই ভারী ভদ্দরলোক! মিছিমিছি মানুষকে কথা শোনাবি!—সমরেন চটে যায়।

—শোনাব তোমার কি? ফুলমণিও চটেছে।

—না, এখানে ওসব চলবে না। তা হলে এখানে থাকা চলবে না।

—বেশ তাড়িয়ে দেবে দাও না—রাগে ক্ষোভে ফুলমণির মাথা দিয়ে আগুন ওঠে।

সমরেন কঠিন হয়ে ওঠে অকস্মাৎ,—আজই চলে যাও এখান থেকে।

—তাই যাব। বলে ফুলমণি মুখ ফেরায়।

সমরেন বেরিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে একটা বিঁড়ি ধরায়। বৌটা উপোস করে আছে ভাবতেই যেন পর মনটা কেমন করে। ফুলমণি রান্নাঘরে খিল লাগায়।

সন্ধ্যায় ধীরেনবাবু আসে। ফুলমণি কাপড়-চোপড়ের একটা বোঁচকা বেঁধে বসে। চলে যাবে। চলেই যাবে। যেখানে খুসী। বাপ মা তার নেই। দেখবার কেউ নেই। তাই আজ সকলের কাছেই বোঝা হয়ে উঠেছে। সমরেন তাকে যা নয় তাই বলে গেল।

ফুলমণির চোখ জ্বালা করে। নিদারুন অপমানে তার চোখ দিয়ে জলও পড়ে না।

ধীরেনবাবু বাসায় ফিরে দেখে ফুলমণি চুপ করে বসে আছে।

—কি হোল রে, অমন চুপ করে বসে আছিস? শুধোয় ধীরেনবাবু চশমার সুতো খুলতে খুলতে।

ফুলমণি কথা বলে না।

ভাবখানা খুব ভাল লাগে না ধীরেনবাবুর।

জামাটা খুলে ফতুয়ায় পকেট থেকে চার আনা পয়সা বার করে।

বলে একটু ভয়ে ভয়ে,—পয়সাটা রাখ। কাল তেলে-ভাজা খাবি। ফালতু রোজগার হোল আজ।

চারানিটা মেজেয় ছুঁড়ে দেয়। মেজেতেই পড়ে থাকে। ফুলমণি একবার তাকায়ও না। বোঁচকাটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ওঠে ফুলমণি। ধীরেনবাবুকে প্রণাম করে বলে,—আমি আজ চলে যাচ্ছি।

ধীরেনবাবু হতবুদ্ধি হয়ে বলে,—কেন? কোথা যাবি?

—ঠিক করিনি। রাস্তায় যাই তারপর ঠিক কোরব। দেশের একখানা টিকিট কাটতে ক'টাকা লাগবে!

ধীরেনবাবু দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়,—কি হোল বল?

—আপনার ভাই বলেছে, আজই আমার যেতে হবে।

—ভাই? কে, সমরা? তার বাড়ী যে সে বলেচে যেতে? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আসুক আজ।

ফুলমণি কিন্তু যাবেই। সে এগোয় দোরের দিকে।

ধীরেনবাবু চোখে অন্ধকার দেখে। ফুলমণিকে পেয়ে বেচারী স্ত্রীর শোক ভুলে আছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়,—কোথা যাবি ?

—সরুন, আমি যাব।

ধীরেনবাবু ফুলমণির হাতখানা ধরে, আমায় ফেলে যাবি ফুলমণি ?

ফুলমণি তাকায় ধীরেনবাবুর দিকে। কোটরাগত জোলো তাল-শাঁসের মত নিরাশ চোখদুটো দেখে ফুলমণি একটু থমকে দাঁড়ায়।

ফুলমণি বলে,—আমি গেলে আপনার কি ?

ধীরেনবাবু তেমনি স্বরেই বলে,—তুই গেলে আমায় কে দেখবে ? এই শরীল, মরেই যাব হয়ত।

ফুলমণির হাত থেকে বোঁচকাটা নিয়ে রাখে ধীরেনবাবু।

—একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে পারিস ?

মানুষটাকে বড় অসহায় মনে হয় ফুলমণির।

এক গ্লাস জল এনে দেয়।

ধীরেনবাবু জল খেয়ে ফতুয়াটা খোলে।

ফুলমণি তাকায় ধীরেনবাবুর দিকে।

বসন্তের বুক-কাঁপা বাতাস আসে দোরের ফাঁকে ফাঁকে। ধীরেনবাবুর শিরাবহুল দেহেও শিহরণ আনে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে বলে,—তোকে কথা দিচ্ছি ফুলমণি আজই সমরাকে এ ঘরে থেকে বিদেয় কোরব।

ফুলমণি একটু ভেবে বলে,—থাক কিছু বলে কাজ নেই।

—না ওকে আজ জুতিয়ে তাড়াব।

তবু বলে ফুলমণি,—না, থাক। কোন কথাই আপনি বলবেন না।

সমরেনের জন্যে ফুলমণির দরদটা ভাল লাগে না ধীরেনবাবুর।

—কেন বল ত' ?

ফুলমণি সহজ হবার চেষ্টা করে বলে,—কি হবে মিছিমিছি ঝগড়া করে।

ধীরেনবাবুও কি ভেবে বলে,—আচ্ছা থাক। কিছুই বলব না।

—না। গালাগাল ত' আমায় করেচে। আপনাকে ত' আর কিছু বলেনি।

—তা বটে!—ধীরেনবাবু বোঝবার চেষ্টা করে কেন সমরেনের এত কটুকথা এত অপমান সয়ে যায় ফুলমণি। কেন সমরেনকে কিছু বলতে গেলে ফুলমণি সইতে পারে না।

—আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিবি ?

আর এক গ্লাস জল দিয়ে ফুলমণি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে আবার।

বাসুদেব উপন্যাস সুরু করেছে।

বিনয় বোস এসেছে দেবযানী সেনের ঘরে।

একটু উঁকি দিয়ে চলে যায় রবীন।

দেবযানী কি দেখতে পেলো ? পাতলা একখণ্ড কাঁচভাঙার মত হাসির আওয়াজ শোনা গেল দেবযানীর। তাকে দেখে হেসে উঠল নাকি ?

না। তাকে দেখে হাসেনি।

হাসছে বিনয় বোসের কথায়।

বিনয় বোস লোকটাকে দেখলে প্রথম প্রথম রাগ হোত রবীনের। বিনয় বোস বুঝি রবীনের কোন লোভনীয় সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চলেছে।

কিন্তু ক্রমশঃ রবীন শান্ত হোল। মনে হোল রবীনের দেবযানী যদি কিছু আনন্দ পায় পাক না! তাতে রবীনের ত' কিছুই আসে যায় না। রবীনের ভাবে রবীন পূর্ণ।

রবীন দেবযানীর ভেতরে যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছে, তা যে এত গভীর এত উদার কে জানত।

রবীনের প্রাণ যেন ছড়িয়ে পড়ে অনেক বড় হয়ে। সেখানে বিনয় বোসদের নিয়ে কোন সংকীর্ণ ভাবের স্থান নেই।

সেখানে রবীন অনেক বড় হয়ে গেছে।

রবীন নিজেই বিস্মিত হয় নিজের ভেতরের প্রশান্তির আস্বাদে। কি সুন্দর আর কি মধুর।

সংসারটাই ওর কাছে আজ নয়নাভিরাম মনে হয়।

দেবযানীকে ভাবতেই ভাল লাগে বেশী। ওর সঙ্গে কথা বলার চেয়েও বেশী। একা একা বসে চুপ করে ভাবা। ভোরের বাতাসে ঘুম ভাঙে। দেবযানীর মত সুন্দর মনে হয় ভোরকে। দুপুরের নির্জনতায় ভাবে রবীন, কি মধুময় দুপুর! রাতের গভীর অন্ধকারের যে এত মাধুরী এও যেন আজ আবিষ্কার করতে পারে রবীন। দেবযানীর মাধুর্য ছড়িয়ে পড়েছে জগতে আপনাআপনিই। রবীনকে কোন চেষ্টা করতে হয়নি। রোধ করবার উপায়ও ওর ছিল না।

সবই কেমন নিজে নিজে হয়ে গেল।

দেবযানীর ফরসা ছোট কপালের খুচরো দু'চার গাছা চুল কি সুন্দর যে লাগে রবীনের।

দেবযানীর ছোট ছোট হাতের পাতাদুটি কি অপরূপ ভংগীতে পাতা থাকে চেয়ারের হাতলে। দেবযানীর বাসন্তী রঙের পাতলা সাড়ীর আঁচল বাতাসে ওড়ে, রবীনের চোখের পলক পড়ে না।

দেবযানীর ডাগর চোখদুটির পাতার নীচে ওর সমগ্র জগত। সব ভুল হয়ে যায় রবীনের।

হাসুক দেবযানী বিনয় বোসের সঙ্গে।

আজ একবার যাবে রবীন ওর কাছে।

বিনয় বোস চলে গেলে।

আরও ভাল করে দেখবে। অনেক সময় ধরে দেখবে দেবযানীব চোখদুটো।

একটা ছুতো ত' আছেই। ক্লাবের চিঠিখানার উত্তর লিখিয়ে আনতে যাবে।

রবীন নীচের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করে একান্ত শান্ত হয়ে।

দেবযানী হাসছে।

বিনয় বোস শুধোচ্ছে,—সত্যি বলছেন? কি অডাসিটি।

—তা ঠিকই, তবু মায়া লাগে একটু।

—কি রকম?—কম কথা বলে বিনয় বোস।

দেবযানীর মুখে কথার ঝরণা,—কেমন জানেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখতে তখন ঠিক একটা মোট বওয়া অসহায় মোষের মত মনে হয়।

বিনয় বোস অল্প হাসে।

দেবযানী বলে,—একটু যদি বুদ্ধি থাকত। অনর্থক অপিস বেরোবার সময় আমার পেছন পেছনে যাবে। এত খারাপ লাগে, তবু বলি না কিছু।

—না, এগুলো ত' খারাপ। কিছু বলেন না কেন?

—বললে হয়ত পায়ের ওপর কেঁদে পড়বে, এমনি ভাবখানা। এত বড় একটা পুরুষ, কি আশ্চর্য অসহায় আমার কাছে, আমার নিজেরই

বিশ্বাস হয় না মাঝে মাঝে। অবশ্য ব্লক হেড্ কিনা। অমন ত' হবেই। ধরুন না, বুনো জাতের লোকগুলো। এম্নিতে ফেরোসাস্; বিশাল চেয়ারা, গায়ের জোর যেন মোষের মত। কিন্তু এত বোকা যে ওগুলো যদি একবার কাউকে ভালবাসে, তার কাছে বলির পাঁঠার চেয়েও অসহায়। তখন তার বিরাট পিঠখানা চাবুক মেরে রক্তাক্ত করে দিলেও পায়ের ওপর পড়ে গোঙাবে।

বিনয় বোস হেসে ওঠে।

দেবযানী খিল খিল করে হাসে।

—আপনার অব্জারভেশন ভারী সূক্ষ্ম। ইচ্ছে করলে ভাল লিখতে পারতেন।

দেবযানী বলে,—এর আবার মুস্কিলও আছে। একবার ধরলে আর ছাড়ে না। জোঁকের মত লেগে আছে আমার পেছনে। কি করা যায় বলুন ত' ?

—এখান থেকে চলুন না ?

—কোথায় ?—দেবযানীর চোখের ভাষা বদল হয়।

বিনয় বোসের চোখে মুখে এসে লাগে এক ঝলক বাতাস।

বসন্তের হালকা বাতাস, এক মুঠো রাঙা ফাগের মত।

বিনয় বোসের কণ্ঠ নেমে যায়,—বলতে ভরসা দেবেন ?

দেবযানীর ঠোঁটে মৃদু হাসি,—ভরসা কি আপনি পাননি এখনও ?

—কি জানি ভয় হয়।

—পুরুষ মানুষের ভয়। কাওয়ার্ড!

বিনয় বোসের পৌরুষে আঘাত করে। একটু এগিয়ে এসে একখানা হাত চেপে ধরে দেবযানীর।

দেবযানী একটুও বাধা দেয় না।

এক মিষ্টি জটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, একটু একটু হাসে। সে হাসির কি যে মানে তা দেবযানীরাই জানে।

বিনয় বোসের কপালে কিছু কিছু ঘাম দেখা যায়। পোখরাজের মত চিক্ চিক্ করে।

হাতখানা হাতের মুঠোয় টেনে নেয়।

—চলুন না আমার সঙ্গে।

দেবযানীর কণ্ঠে সঙ্গীতের আমেজ,—কোথায় ?

—আমার কাছে। একটুকুই কি যথেষ্ট নয় ?

—আপনার চোখে যে স্বপ্ন।

—স্বপ্ন সার্থক হতে দিন।

—যদি কখনও এ স্বপ্ন ভেঙে যায়। ভয় হয়।

—কি ভয় ?

—তখন ত' আমার কোন দামই থাকবে না!

—আপনার দাম সত্যে, স্বপ্নে নয়।

দেবযানী ফিস্ ফিস্ করে বলে,—এ কথা আপনার মিথ্যে।

হাতটা একটু আলগা হয়ে আসে বিনয় বোসের।

দেবযানীর ঠোঁটে সেই হাসি। যে হাসির কোন মানে নেই।

চোখে সেই দৃষ্টি।—যে দৃষ্টি কিছু দেখে না।

বিনয় বোস আহত হয়েছে।—এখনও অবিশ্বাস ?

দেবযানী শুধু বলে,—আরও দিন যাক না ?

বিনয় বোস হাত ছাড়তে চায়। দেবযানী ছাড়ে না এবার।

একটু বরং চাপ দেয় হাতে।

এক ঝলক বাতাসে ভেজানো দরজাটা খুলে যায়।

বিনয় বোস সরে বসে।

দেবযানীর চোখ দুটোয় বিদ্যুতের ঝিলিক !

উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় ।

—এ কি করলেন ?

—ভয় নেই ।—দেবযানী হাসে, এক অদ্ভুত হাসি।

তারপর ধীরে ধীরে একটা মোমবাতি জ্বালায় ।

মোমের আলোর প্রলেপ যেন মোমের মতই নরম। বেশী উজ্জ্বল ঝলক্ নেই তার ।

দেবযানী বলে,—কেমন ? ভালো লাগছে না ?

বিনয় বোসের সত্যিই ভালো লাগে এই নরম আলো ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে ।

বিনয় বোসের বাড়ী যাবার কথা মনে হয়।

—এবার উঠি মিস্ সেন ?

—আর একটু বসুন না ? —আরও একটু কাছে আসে দেবযানী।

নীচে রবীন বসেছিল বারান্দায় ।

তাকাল একবার আকাশের দিকে। তারা ভরা কালো আকাশের দিকে তাকাতে ওর কত ভালো লাগে তখন। আগে কখনও কি এমন করে আকাশ দেখেছে রবীন ?

এখনও ত' বিনয় বোস বেরোল না ?

আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করবে রবীন ?

বিনয় এবার ওঠে—আমি এবার আসি মিস্ সেন ।

—আসুন ।

দেবযানী কিন্তু নড়ে না। চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছে দেবযানীর। বসে আছে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে আধবোজা চোখে! যেন কোন নেশায় মন ভরে গেছে ওর ।

সামনে জানলা দিয়ে দেখা যায় নির্মেঘ এক টুকরো কালো আকাশ। মাঝে মাঝে মৃদু বাতাসের মিষ্টি প্রলেপ। মনকে রসভার করে তোলে।

বিনয় বোস কখন চুপচাপ উঠে গেছে।

দেবযানীর চোখ ভরে ঘুম আসে। এক মধুর আরামের আধো-ঘুম।

রবীন উঠে আসে ভয়ে ভয়ে। বুকটা অকারণেই কাঁপে।

ঘরে ঢোকে।

কিছুই দেখা যায় না ভালো করে।

মোমের আলোয় চোখ মেলে দেখতে পায় রবীন। দেবযানী চেয়ারে ঘাড় এলিয়ে আছে। যেন ঘুমোচ্ছে। একখানা হাত চেয়ারের হাতল থেকে হেলে পড়েছে একটু বেঁকে। সাড়ীর আঁচল লুটোচ্ছে মেঝেয়। নরম চুলের আল্‌গা-বাঁধা খোঁপাটা আধখোলা হয়ে পড়েছে চেয়ারের পেছনে।

বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে রবীনের।

দোতলায় সাড়া শব্দ কারো বিশেষ নেই।

ধীরেনবাবুদের ঘরে সাড়া নেই। সমরেন বোধহয় আসেনি এখনও। ধীরেনবাবু নেশা করতে বেরিয়েছে।

বাসুদেবের ঘরও নীরব। শুধু আলো জ্বলছে একটা।

রবীন কি করবে ভেবে পায় না। ডাকবে কি ডাকবে না। যেতেও পারছে না, থাকতেও পারছে না। হাত পা ঘামছে।

পা দুটো আঠার মত আটকে আছে মেঝেতে। নড়বার ক্ষমতা নেই যেন।

শুধু চোখে ওর অমৃতপানের আনন্দ।

একবার একটু এগোলো অনেক কষ্টে। আবার পিছিয়ে এলো। দেবযানীর চোখের তলায় কাজলের মত কালি পড়েছে। কেন কে জানে ?

দেবযানীর অতি সাবধানী বেশবাস অত্যন্ত অসাবধানে আজ সরল সহজ হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ রবীন দোরটা বন্ধ করে দেয়।

নিভিয়ে দেয় মোমের আলোটা।

বুকটা কাঁপতে থাকে খুব বেশী। কাঁপুক।

রবীন খুব আস্তে আস্তে দেবযানীর সাড়ীটা কাঁধে তুলে দেয়। কপালে হাতখানা রাখে।

খুব আস্তে শোনা যায়।—কে ?

রবীনের হাতখানা আর দুখানা নরম হাতের তলায় বন্দী হয়। ফাঁসীর বন্দীর মত ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে রবীন। কি করতে গিয়ে কি হোল। এমন ত' ভাবেনি রবীন!

—কে, বিনয় ?—নরম মধুর জিজ্ঞাসা কানে আসে।

রবীন নীরবে ভাবে কি করবে ও। কি বলবে, কিই বা বলবে না।

দেবযানী কাঁধের ওপর রবীনের হাত দুটো টেনে নেয়।

আবার আকর্ষণ!

এ আকর্ষণে এমন অস্বাভাবিক জ্বালা কেন ? এমন বিকৃত উত্তেজনা ত' রবীনের প্রেমের কল্পনায় ছিল না।

এ কি! এ যেন পাঁচতলা থেকে অকস্মাৎ একতলায় নেমে আসা।

কোথায় তার প্রশান্ত আনন্দ। গভীর শীতল ভাব!

দেবযানীর এ আকর্ষণে কোথায় যেন তীব্র ঝাঁজ অনুভব করে রবীন। সহ্য করতে পারছে না রবীন। একেবারে ভাল লাগে না ওর।

ওর ভাব-গভীর স্নিগ্ধ মন যেন একমুহূর্তে অসংখ্য বুদ্বুদের মত ফোটে ফাটে।

এমন ফাঁকা হাত ত' সে চায় না।

না। রবীন সইতে পারছে না।

ও বলে ফেলে,—না। একি!

বিদ্যুতের মত তড়াং করে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে দেবযানী সেন, এম, এ।

আলো জ্বলে ওঠে।

রবীন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর গালে পাঁচ ছটা চড় বসিয়ে দেবযানী সাড়ী সামলায়।

চড় খেয়েও রবীন নড়ে না। তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

—বেরিয়ে যাও ষ্টুপিড। রাস্কেল কোথাকার!

কোন একটা এলোমেলো-সুইচ টিপলে মেসিন খুব জোরে খানিকটা চলে যেমন বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি দেবযানী চোখ মুখ লাল করে ধমকে উঠলেও অবশেষে যেন চুপ্‌সে যায়।

রবীন দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি চুপ করে।

দেবযানী যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ে।

চেয়ারে আবার বসে শুধোয়,—কখন এসেছিলে?

রবীন তাকায় ওর দিকে। রবীনের মুখখানা শুকিয়ে নীল হয়ে উঠেছে।

বলে,—কিছু আগে।

—আমাকে ডাকলেই পারতে। থাক্—

বলে যেন থেমে দুর্বলভাবে এলিয়ে পড়ে চেয়ারে। বলে রবীনকে,—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো?

রবীন জল দেয় এক গ্লাস. নীরবে।

দেবযানী এক গেলাস জল খেয়ে ফেলে ঢক্ ঢক্ করে। কি শুষ্ক তৃষ্ণা !

আস্তে আস্তে শুধোয় রবীনকে,—কেন এসেছিলে ?

—ক্লাবের একটা চিঠি ছিল।

হাসে দেবযানী,—ওটা ত' বাইরের কথা। সত্যি কেন এসেছিলে ?

রবীন চুপ করে থাকে। অতবড় জোয়ান ছেলেটা যেন বোবা হয়ে গেছে।

দেবযানী বলে,—আমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াও, তাকিয়ে থাকো যখন তখন, দু একবার উঁকি দিয়ে চলে যাও, আবার এসে কোন মতে আলাপ করতে চাও, কেন বলো ত ?

দেবযানী যেন একটা চোরকে জেরা করছে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে। রবীন হয়ত পালাবে, নয় ত ভয়ে ভয়ে এক কথা সে কথা বলে ঢাকবার চেষ্টা করবে। তখন বেশ ভাল করে ধমকে দেয় আর একবার যেন আর কোনদিন ছেলেটা বিরক্ত না করে। এতই নীরেট গাধা। দেবযানীর শিক্ষা দীক্ষা রূপকে ডিঙিয়ে আসতে চায় যেন। কি বোকার মত স্পর্দ্ধা।

দেবযানী সেন, এম, এ,। রূপসী। মার্জিতা। বহু বিলেত-ফেরতেরও লোভনীয়া। তার কাছে কুকুরের মত আসতে চায় একটা আড্ডাবাজ মূর্খ সেলস্‌ম্যান ছোকরা।

—কেন এখানে আসতে চেষ্টা করো ?

রবীন স্থির দৃষ্টিতে তাকায় দেবযানীর দিকে। দেবযানী জানেনা যে রবীন কি নির্ভর আস্বাদ পেয়েছে তার জীবনে। রবীন সহজ স্বরে বলে,—আপনাকে দেখতে।

—দেখতে ? আমাকে ? কেন ?—হাসি পায় দেবযানীর।

—ভাল লাগে বোলে।

দেবযানী যেন দড়ি-বাঁধা কুকুর হাতে পায়,—বাঃ! বেশ ত'! ভাল লাগে বলে ? বেশ, আমি যা বোলব তাই করতে পারবে ?

—আপনার ভাল লাগলে পারব।

দেবযানী মনে মনে অজস্র হাসে। গরবের হাসি।

রবীনও মনে মনে হাসে। গভীর আনন্দের হাসি।

দেবযানী উঠে বলে,—কই দেখি তোমার চিঠি ?

ক্লাবের চিঠিটা বার করে দেয় রবীন।

চিঠিটা পড়ে বলে,—উত্তর তোমার বোনই লিখতে পারবে। ও ত, আই, এ, পড়ে।

রবীন ঘাড় নাড়ে।

চিঠিখানা ফেরত দেয় দেবযানী।

—কাল আবার এসো। সন্ধ্যের আগে। বিকেলে।

—আসবো।

রবীন নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দেবযানীকে তাকে নিয়ে ইচ্ছেমত খেলবার পুরো অধিকার দিয়ে।

বাসুদেব উপন্যাস থামালো।

মালতী ডাকে,—খাবে না এখন ?

বাসুদেব উত্তর দেয় না।

মালতী সামনে আসে,—কি যে লেখো দিনরাত্তির। কি লিখছ ?

—গল্প। প্রেমের গল্প।

—রামোচন্দর! প্রেমের গল্প আবার আজকাল কেউ পড়ে নাকি ?

মালতী বলে,—আজকের সমাজে প্রেমের ন্যাকামির স্থান নেই। াদের আলো আর ভালবাসি আর বড় জোর এক গোছা রজনীগন্ধা। ্যাস্! এ সব ন্যাকাপনা তোমার ভালো লাগে?

ওর কথা বলবার ধরনে হেসে ফেলে বাসুদেব।—ন্যাকাপনা সত্যিই ভালো লাগে না। কিন্তু যা গভীর সত্য তা' ভালো লাগে।

মালতী বলে,—আজকাল আর ও সব প্রেম-ট্রেম নেই।

—কে বললে?

—আমি বলছি! পড়ো বড় বড় নেতার কথা। তারা বলে, এখন শুধু কাজ চাই, বিজ্ঞান চাই, ইঞ্জিন চাই, খাদ্য চাই, শিক্ষা চাই।

—প্রেমও চাই। প্রেম যদি না থাকে কোন কাজই হবে না। মি ভালোবাসো বলেই ত' কাজ করো। প্রেম নেই। অথচ কাজ আছে। এ যেন রস নেই রসগোল্লা আছে।

—কি যে বলো। প্রেম ছাড়া হয় না কোন কাজ।

—হয় না। তুমি জানো না মালতী প্রেম ছাড়া হয় না। বিন্দু বিন্দু ইলেকট্রন প্রোটনের আকর্ষণও যেমন প্রেম, সূর্য গ্রহ তারা আর পৃথিবীর এই নিরন্তর ঘোরা আর চলা এও সেই প্রেমের আকর্ষণ।

মালতী হাসে,—বড় বড় কথা বুঝি না।

বাসুদেবের কণ্ঠ গভীর হয়ে আসে,—কি জানো। কাজের ওপর প্রেম না থাকলে ত কাজ হয় না। মানুষের জন্যে বুকভরা প্রেম না থাকলে ত্যাগ হয় না। দেশকে প্রাণ ঢেলে না ভালবাসতে পারলে দেশপ্রেম হয় না। প্রেম ত' সামান্য নয় মালতী। প্রেমই সত্য।

মালতী বাসুদেবের এমনি গভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতেই ভালোবাসে। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বাসুদেবের মুখের দিকে।

—ভালবাসতে পারা কম কথা নয় মালতী। সংসারে প্রেমের সত্য

যে পায়, সে ত' সবই পেলো মালতী। আর যে হতভাগা পায় না সেই-ত' প্রেমের নামে বিকারকে সম্বল করে জীবনকে বানচাল করে—মনকে অন্ধকারের ভয়ে ভরে দেয়। প্রেম যে আলো! আলো সে পাবে কোথায়?

মালতী এক মনে শোনে বাসুদেবের কথাগুলো। কি সুন্দর বাসুদেবের গলা। কি সুন্দর দীপ্ত চোখদুটো আর তীক্ষ্ণ নাক!

—কি দেখছো? হঠাৎ শুধোয় বাসুদেব।

—প্রেম!—বলেই হেসে ফেলে মালতী।

বাসুদেবও হেসে ওঠে।

হালকা বাতাসে বাসুদেবের পাতলা চুলগুলো উড়তে থাকে।

মালতী হঠাৎ যেন ছেলেমানুষের মত বলে,—চুলও কি আঁচড়াতে পারো না?

বলে উঠে গিয়ে চিরুণীটা এনে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাসুদেবের চুল আঁচড়াতে থাকে।

বাসুদেব মনে মনে না হেসে পারে না ওর ছেলেমানুষীতে।

তবু চুপ করে থাকে। কিছু বলে না।

মালতী চুলটা ভালো করে আঁচড়ে দিতে দিতে জানালার বসন্ত বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বাসুদেবের গালের ওপর নিজের ছোট ছোট হাত দুখানা রাখে।

বাসুদেব মালতীর মনের তাপের আঁচ পায়।

ধীরে ধীরে হাত দুটোকে নামিয়ে দেয়।

—একটু লিখব মালতী।

মালতী বাসুদেবের নীরব ইংগিতে লজ্জায় রাগে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু ভেতরে জ্বলে।

জলুক। তবু নয়। বাসুদেব দৃঢ় হাতে ওকে ওপাশে সরিয়ে দেয়।

মালতী সরতে চায় না। জোর করে দাঁড়িয়ে থাকে বাসুদেবের পেছনে।

বাসুদেব চুপ করে তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে আকাশে।

ওদের দুজনের মনেই অকস্মাৎ যেন গুমোট মেঘ নেমে এলো।

কি যে কারণ কে জানে!

বাসুদেবের চোখের পাতা পড়ে না। ঠোঁটদুটি কঠিন হয়ে ওঠে।

কালো আকাশের ওপারে নিষ্প্রভ দু' কলা চাঁদ দেখা দিয়েছে।

রাত কম হোল না।

বাসুদেবের কাঁধের ওপর উষ্ণ জল পড়ে।

বোঝে মালতীর চোখের জল টপ্ টপ্ করে পড়ে।

বাসুদেব চুপ করে বসে থাকে। একটা কথাও বলে না।

মালতীর বেদনার পরিমাপ করতে পারে না। তবু হৃদয় দিয়ে কিছু অনুভব করা যায়।

বাসুদেবের মন গভীর—অতল। সেখানে ভাবের ঢেউ ওঠে না। স্থির শীতল।

মালতীর মনের ঢেউ এসে লাগে সেখানে, তবু কোন বিকার আসে না। যেন নদীর ঢেউ এসে স্থির হয়ে যায় সমুদ্রের গভীরে।

—অনেক রাত হোল বোধহয়।—বলে বাসুদেব।

মালতী শোনে না। হোক রাত!

সেইখানেই চুপ করে বসে মালতী। মুখ ঢাকে দুহাতে।

বাসুবেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার খাতা কলম ধরে।

উপন্যাস সুরু হোল আবার।

সুতীব্র বেদনায় যে এত আনন্দ কে জানত ?

কে জানত যে সংসার সবচেয়ে বড় অপমানকে বুক পেতে সইবার মত বিশাল হয়ে ওঠে মনের পরিধি বুঝতে পারে আর তৃপ্তির পূর্ণতায় ভরে ওঠে।

দেবযানী জানে না যে দেবযানী কত মহৎ।

দেবযানী কি করে বুঝবে যে রবীনকে সে ভরে তুলেছে, পুষ্পিত করেছে অপরূপ রসাবেশে।

সহরের এক অতি মূর্খ হালকা ছেলে রবীন কত গভীর হয়ে উঠেছে।

দেবযানীর আদেশ।

রবীন পরদিন বিকেলে দেবযানীর ঘরে আসে।

দেবযানী অল্প সময় হোল অপিস থেকে এসেছে। সঙ্গে বিনয়। রবীনকে দেখে দেবযানী বললে,—এসেচো। বেশ করেচো। ওই ষ্টোভ আছে। ধরিয়ে দুকাপ চা করো ত' ?

রবীন ষ্টোভটা ধরাতে যায় নীরবে।

—আর এককাপ কোর—তোমার। —বলে দেবযানী।

বিনয় বোস চোখের ইসারায় শুধোয়,—এ কে ?

দেবযানী ইসারা করে—পরে বোলব।

রবীন চা তৈরী করে।

—ওই তাকে কাপ ডিস আছে।

কাপ ডিস নামিয়ে চা ঢেলে ফেলে রবীন।

আস্তে বলে,—চিনি দিয়ে নিন। বেশী হয়ে যেতে পারে আমি দিলে।

কি মিষ্টি গলা রবীনের। মধুময় হয়ে উঠেছে ওর কথা গুলো আত্মতৃপ্তিতে।

বিনয় বোস বিস্মিত হয়। দেখতে ত' বেশ ভদ্রলোকের মত। এ কি চাকর ?

দেবযানী চায়ে চিনি ঢালতে ঢালতে রবীনের নীরবতায় বিস্মিত হয় কম নয়।

তবু বিনয় বোসকে দেখাবার জন্যেই যেন বলে,—আমার জুতো-জোড়া ওখানে রেখে চটিজোড়া দাও।

রবীন নীরবে আদেশ পালন করে।

একেবারেই ভেড়া!

ভালই হয়েছে ছেলেটাকে দিয়ে চাকরের কাজ চলবে—মনে মনে হাসতে হাসতে ভাবে দেবযানী সেন।

এবার রবীন নিজের চায়ের কাপটা নিয়ে বসে। বিনয় বোসের সামনে দেবযানীর এমন অপমানকর ব্যবহারও ওকে পরাজিত করতে পারে না।

দেবযানীর এ ব্যবহারের পেছনের দুর্বলতাটুকু ও ধরে ফেলেছে।

ও নিশ্চিত জানে দেবযানী কোথায় দুর্বল। কোথায় সে মহৎ!

ও নিজেকে অনেক ছোট করে ভাবতে শিখেছে, ও নিজে কত মূর্খ। কত বাজে!

চায়ে চুমুক দিয়ে বলে,—ডেকেছিলেন কেন?

দেবযানী বলতে পারে না যে এই জন্যেই। শুধু বলে,—আবার কাল এ সময়ে এসো

রবীন নীরব ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই কানে আসে বিনয় বোস আর দেবযানীর হাসির শব্দ।

ওরা হাসছে।

রবীন নির্বিকার মনে বেরিয়ে যায় ক্লাবে। মনের কোন এক অজ্ঞাত বাণীতে ও নিশ্চিত ভরসা পেয়েছে যে দেবযানীকে সে পাবেই। এ জয় তার অবধারিত।

আবার লেখা বন্ধ করে বাসুদেব।

তাকায় পেছনে। মালতী ওখানেই শুয়ে পড়েছে গুটি সুটি হয়ে।

ওঠে বাসুদেব।

আরও ভাল করে তাকায় মালতীর দিকে।

মালতীর মসৃণ গালের ওপর স্পষ্ট চোখের জলের দাগ।

—মালতী।

মালতীর সাড়া নেই।

—মালতী। ওঠো।

সাড়া নেই মালতীর।

একবার হাত বাড়াতে যায় বাসুদেব মালতীর মুখখানির ওপর।

মুহূর্তে হাত সরিয়ে আনে।

ধীরে ধীরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

অবসন্ন ক্লান্ত মালতী তেমনি পড়ে থাকে ঘুমে বিভোর হয়ে।

বাসুদেব বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারে না। কোন দুশ্চিন্তা নেই। তবু ঘুম নেই। আলোটা নেভাতে হয়। অন্ধকার ঘরটা প্রথমে কালো মনে হয়। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারটা পাতলা হয়ে আসে। রাত গভীর হয়।

কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ কিছু আগেই ডুবে যেতে বসেছে।

আবছা আলোয় মালতীর ছোট দেহটি দেখে বাসুদেব। ঘুম আসে না। ভারী আরাম লাগে এমনি চুপ করে শুয়ে মালতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে।

ওই দেহটা ওর পড়ে আছে এখানে।

ওই দেহটা ত' মালতী নয়। মালতী নিজেও একথা জানে না। কেই বা জানে সংসারে।

না। বাসুদেবই কি জানে। তবু আজ এই অন্ধকার ঘরে ও যেন আবিষ্কার করে মালতীর সত্য পরিচয়কে।

ওই দেহটার কোন মানেই থাকত না যদি না মালতীর মন বলত—আমি এই দেহ।

ওর মনের কোনই মানে হোত না, যদি না বিশ্বমনের বিরাটের সুরে বাঁধা থাকত ওর মন।

সে সুরের বা কি মানে, যদি না সে সুরতরঙ্গ বিশ্বচেতনার থেকে ভেসে উঠত। সেই চেতনারই সুর বিলাস—আনন্দ আসর।

এ বিচিত্র আসরে শুধু আমোদ আর প্রেমের হিসাব-নিকাশ! আজ পাওনা কাল দেনা। বড় মধুর! বড় সুন্দর!

বাসুদেবের বড় বড় চোখদুটি ছল ছল করে ওঠে—মনে মনে আজ না বলে পারে না ও—আনন্দ মধুময়, তুমি আরও মধুময় হয়ে ওঠো। মালতীর প্রেম, এ ত তোমারই প্রেম। এ আস্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোর না, ভিখারী কোর না আমায়।

বাসুদেব মালতীর দিকে তাকায়। উঠে আসে।

গায়ে হাত দেয় বাসুদেব। মালতীর দেহে নয়। ওর মনের কিনারায়।

—মালতী।

মালতী বাসুদেবের হাতটি ধরে, যেন ওর আলো ছুঁয়ে আলোকিত হতে চায় মালতী।

—মালতী ?

—কি ?

—তুমি তবু কেন আমার কাছে থাকো।

মালতী ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারে না যে কেন সে থাকে।

সম্পর্ক কি? কিছুই নয় হয়ত। তবু মালতী যে কেন থাকে বাসু-দেবের বোঝবার উপায় নেই।

—এত কষ্ট তোমার?

—তোমার কাছে থেকে সব ভুলে যাই। তাই থাকি।

—কি করে ভোল?

—জানিনে। বোধহয় তোমার ভেতরে কখনও দুঃখ দেখিনি। তাই ওটা ভুলে যেতে হয়!

—তুমি কাছে না থাকলে তোমাকে বেশী করে পেতে পারি আমি।

—আমি ত' তা পাই না। আমি যে মেয়েমানুষ।

বাসুদেব মৃদু মধুর গলায় বলে,—তুমি চলে যাও মালতী।

—কোথায়?

—অন্য কোথাও।

—না।

—তবে আমি যাই।

—না!

—আমাকে আরও মুক্ত হতে দাও। আরও ছড়িয়ে পড়তে দাও।

—আর আমার মুক্তি যে তোমার ভেতরে খুঁজে পাই।

—কেমন করে?

—সবই ত' জানো! তবু শুধোও।

—হ্যাঁ, শুধোই। এমন একটা মিথ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলে সত্যকে খোঁজা কি করে চলে?

—তোমার জন্যে যে আমি সব পারি। এ তারই একটা প্রমাণ।

—কেমন।

—সত্য মিথ্যে কিছুই যে তোমার চেয়ে বড় নয় আমার কাছে।

বাসুদেব নীরব হয়ে যায়।

রাত গড়িয়ে যায় আলকাত্‌রার মত।

মৃদু বাতাসে কেঁপে ওঠে ওরা।

প্রশান্ত নীরবতায় বাসুদেব আরও স্পষ্ট করে দেখতে পায় মালতীকে,—আমাকে হার মানালে তুমি।

মালতী সর্ব সমর্পণের স্বরে বলে,—আমি আর কই, সবই ত' তুমি।

—আবার হার মানলাম।

আরও সময় গড়ায়।

রাত বাড়ে।

কোথায় কোন এক প্রাসাদের বারান্দায় খাঁচায় ভরা কোকিল ডেকে ওঠে।

বারান্দায় খট্ খট্ শব্দ হয়।

বোধ হয় ধীরেনবাবু এলো, না হয় এলো সমরেন।

দোর খুলেছে ফুলমণি।

বাসুদেব উঠে আসে।

আলোটা জ্বালে।

মালতী উঠে বসে।

নিজের বিছানাটা পাতে।

একবাটি দুধ এনে বাসুদেবের হাতে দেয়,—খেয়ে নাও।

—আর তুমি?

কি অপরূপ তৃপ্তি চোখ দুটিতে ভরে নিয়ে বলে মালতী,—তুমি খাও।

বাসুদেব একটা ছোট গ্লাসে কিছুটা দুধ ঢালতে যায়।

—এক ফোঁটাও নয়। সবটা খেতে হবে।

বাসুদেব নীরবে সবটা খেয়ে নেয়।

পরম তৃপ্তি বুকে নিয়ে এবার শোয় মালতী।

—আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।

আলোটা নিভিয়ে বাসুদেব কিছু দূরে আলাদা বিছানায় শোয়।

দুজনেরই ঘুম নেই। তবু দুজন দুজনার থেকে অনেক দূরে।

মাঝে থাকে এক বিশাল প্রাচীর।

এ প্রাচীর ভাঙবার সাধ্য নেই কারও।

মালতীর নয়।

বাসুদেবেরও নয়।

কেন, কেই বা জানে।

দুটি পাতলা রুমালে ছোট ছোট লাল তিনটে করে ফুল তুলছে নুপুর, আর দুটি করে ফিকে সবুজ পাতা।

গত পরশু কথায় কথায় বলেছিলো সুবীর,—রোববার আমার জন্মদিন। আসতে হবে আপনাকে।

রোববার মানে কাল। ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না নুপুর, কি উপহার দেয়া যায়।

ওরা অত বড়লোক। ওদের টাকা দিয়ে কোন জিনিষ কিনে দিলে চোখেই লাগবে না। হয়ত হাসবে।

সিগারেট কেস একটা ভাল দেখে দিতে গেলেও সাড়ে চারটে টাকা। অত টাকাই বা কই?

জমানো আছে একটাকা ন'আনা। আর বড় জোর একটা টাকা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেয়া যায়। তাতে ত' কিছুই দেয়া যাবে না।

কাল রাত্তিরে বসে বসে ভাবছিলো নুপুর বইয়ের পাতাটা খুলে।

ঝুমুর যেন ওর মনের কথা টের পায়,—কি ভাবছিসরে দিদি?

—কই কিছু না ত' ?

—বইয়ের পাতাটা ত' খুলে রেখেছিস কতক্ষণ হোল। নিশ্চয়ই ভাবছিস কিছু।

ঝুমুর ট্রান্স্লেশন করতে করতে কলমের ডগাটা দাঁতে কামড়ে বলে।

নুপুর চমকায়,—তোর ওই কলম কামড়ান ব্যাড্ হ্যাবিট্টা গেল না।

ঝুমুর কলম নামায়। আবার ট্রান্স্লেশন করতে থাকে। কিছুতেই ওর মাথায় ঢোকে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউনাস টেন্স কি করে ধরবে ও। মাঝে মাঝে এমন বিরক্তি ধরে! কি হবে ম্যাট্রিক পাস করে। বিমলদা' ত' ম্যাট্রিক পাস। পুরুষ মানুষের সমান সমান হওয়া কি ভালো।

ঝুমুর বিরক্ত হয়।

তবু দিদির ভয়ে পড়তে হয়।

নুপুর ভেবে কোন কুল-কিনারা পায় না। কি দেয়া যায় সুবীরের জন্মদিনে। অমলাকে নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করেছে সুবীর। দু চোখে দেখতে পারে না নুপুর অমলাকে। কি দেমাক! ভাল করে কথাই বলে না ক্লাসে কারো সঙ্গে। ভারী ত' সুন্দর দেখতে। ছিপ্ছিপে ফরসা। চোখ দুটো ত' তাও বাদামী। চুলও লালচে।

পয়সায় পাল্লা দিতে পারে সুবীরের সঙ্গে। বাপ নাকি মস্ত ব্যারিষ্টার। টাকার আণ্ডিল। সুবীরের সঙ্গে ওর প্রথম থেকেই আলাপ।

খুব যে গম্ভীর তা মনে হয় না। তবে মাঝে মাঝে সুবীর অমলার পেছু পেছু গিয়ে যখন কি একটা অনুরোধ করে আর অমলা তাচ্ছিল্য করে ওকে উড়িয়ে দিয়ে নিজের গাড়ীতে ওঠে, তখন ক্লাসের সব মেয়েরই বুকে বিছে কামড়ায় যেন। সুবীরের মত ছেলে। তাকে হেলা-ফেলা! কি দেমাক।

তবু সুবীর আবার কথা বলে। আবার হাসে।

অমলা কম কথা বলে। কম হাসে।

নুপুরের গা জ্বলে যায়। তবু নুপুরের ওপর সুবীরের টানটা যে অমলার চেয়ে অনেক বেশী, অনেক ঘনিষ্ঠ সে প্রমাণ ত' পেয়েছেই সে।

অমলা নিশ্চয়ই একটা ভালো কিছু প্রেজেণ্ট করবে।

নুপুর ভাবতে ভাবতে জ্বলতে থাকে। কেন যে তারা গরীব হোল!

—ঝুমুর?

ঝুমুর ট্রান্‌স্লেশন থেকে মুখ তোলে,—কিরে দিদি।

নুপুর নিজে ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে যেন অসহায় হয়ে শুধোয়,—একটা জন্মদিনে নেমন্তন্ন রোববারে। কি দেয়া যায় বল ত'?

ঝুমুর মুখ টিপে হাসে, শুধোয়,—ছেলে, না মেয়ে?

নুপুর অসহায়। বেচারী বলে ফেলে,—ছেলে, মস্ত বড়লোক। কি যে দিই!

ঝুমুরকে বেশী ভাবতে হয় না, বলে—দেনা, ইয়ে—রুমাল দেনা নিজে হাতে ফুল তুলে।

নুপুর যেন কুল পায়,—ঠিক বলিচিস্।

এই না হলে আর বোন! ঝুমুরকে ত' এই জন্যেই ভালবাসে। নুপুর ভারী খুসী।

পরদিনই সকালে সাদা আধ গজ কাপড় কিনে আনে নুপুর।

দুটি রুমাল দেবে ছোট ছোট।

তিনটে করে ছোট লাল ফুল, আর এক জোড়া ফিকে সবুজ পাতা।

মায়ের মাছ কুটে দিয়ে আসে ঝুমুর।

শুধোয়,—কিরে দিদি, হোল?

নুপুর বলে,—অনেক দেরী। আজ বিকেলে শেষ হবে।

—কেমন খাওয়াবে রে ?

—চায়ের নেমন্তন্ন।

ঝুমুর হাসে,—তা হোক বড়লোকের চায়ের নেমন্তন্ন ত'! নিশ্চয়ই সিঙ্গারা, রসগোল্লা, নিম্‌কী, সন্দেশ— ।

—থাক্ তোর আর লিষ্ট বলতে হবে না।

—চা, কফি, কোকো, যাই চাই। কি বলিস্ ?

নুপুর বলে,—তা হতে পারে ?

রবীন ঘরে ঢোকে ।

নুপুর বলে—আজ আর কলেজ যাব না ভাবচি। এটা শেষ করতে হবে।

ঝুমুর চলে যায় ।

পরদিন সন্ধ্যায় নুপুর সাজগোজ করে ছোট্ট ব্যাগটিতে রুমাল দুটি পুরে নিয়ে বেরোয়। যেতে যেতে বারে বারেই তাকিয়ে দেখে সাজটা কেমন হোল। আকাশী রঙের সাড়ীটিই তাকে মানায়। সেটি পড়েছে। কিন্তু ব্লাউজটা ঠিক যেন ম্যাচ্ করছে না। ফিকে বেগুনী রঙের ব্লাউজ হলেই মানাতো। স্যাণ্ডেলটাও রঙচটা। সাবান মেখে চুল ফাঁপিয়েছে, তবু শ্যাম্পুর মত হয়নি।

চোখে মিহি করে কাজল পরলেও আঁকা হোলনা ওপরের দেবযানীর মত বা অমলার মত।

তবু নুপুরকে দেখাচ্ছে খারাপ নয়।

গায়েগতরে নুপুর একটু ভারী। তবু তার মুখখানা খুব মিষ্টি মিষ্টি বলে সবাই।

নুপুর ট্রাম থেকে নামে!

এই ত' সুবীরদের বাড়ী।

বাইরের ঘরের সামনে কয়েকটি ছেলে, নবীন, সত্যেন আর ওটা? ওই ত' টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায় নূপুরের দিকে পান খাওয়া দাঁত বার করে হাসে। আর ওটা? অসব্য ছেলেটা। যে টিটকারী ছাড়া কথা বলে না। আর মোটা বীরেনও আছে। হাসাতে ওর জুড়ী নেই।

ঘরের সামনে গিয়ে মেয়েদের গলা পায়।

সবাই-ই আছে। অমলাও।

নূপুর যেতেই সবাই তাকায়।

আয় ভাই। আমার পাশে। বলে পংকজিনী।

আর বাণী সেন বলে ওঠে,—সুবীর কোথা গেলো?

বোধহয় ভেতরে।

সুবীর আসে একটু পরেই। নূপুর নড়ে চড়ে বসে। এত মেয়ের মাঝে সুবীর যেন নূপুরকে ভাল করে দেখতেই পায় না।

নূপুর উঠে দাঁড়ায় সাড়ী ঠিক করবার আছিলায়।

সুবীরের চোখ পড়েনা। সুবীরের চোখ বারে বারেই ঘুরে ঘুরে প'ড়ে একজনের উপর। ঘরের কোনে বসে আছে ওই অমলার দিকে। অমলা সবার চেয়ে একটু তফাতে বসেচে একা। কথা যে দু'একটি বলচে না তা' নয়। তবু বেশী কথা নয়।

নূপুর বলে ওঠে,—এই যে। দেরী হয়নি ত' আমার?

সুবীরের চোখ পড়ে। নিতান্তই সাধারণ ভাবে বলে,—ও! আপনি! ঠিক সময়েই এসেছেন। বসুন।

ম্লান হয়ে যায় নূপুরের মুখখানা।

নূপুর তবু একটু এগোয় রুমাল দুটো দিতে।

সুবীর কিন্তু ওকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ডাকে অমলাকে,—একবার শুনবেন?

অমলা উঠে বলে,—আমায় বলছেন?

হ্যাঁ। একটু ভেতরে আসুন না।

অমলা একটু ইতস্তত: করে,—দেরী হয়ে গেল আমার। বাবা ভীষণ রাগ করবেন।

আর দেরী হবে না।—হাসে সুবীর,—আসুন। আপনাকে আগেই ছেড়ে দিচ্ছি।

ভেতরে যায় সুবীর আর অমলা।

নুপুর এসে আবার বসে।

কান দুটো ওর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

এর পরও কি সে আর থাকবে এখানে? কিন্তু না থেকেই বা উপায় কি! কি ভাববে সবাই? চুপ করে বসে থাকতে হয় নুপুরকে।

কিছুপরে অমলা চলে যায়। গাড়ি অবধি এগিয়ে দেয় সুবীর।

বাণী সেন টিট্‌কিরী দেয়,—অমলাকে বোধহয় সুবীরের মায়ের সংগে আলাপ করতে নিয়ে গেল ভেতরে?

পংকজিনী বলে,—তা হবে। ওদের ত' আবার খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হয়।

তাই নাকি?

অমলা কি দিলে?

বাণী সেন হাসে,—অমলার বন্ধু বাণী সেন, বলে,—সব চেয়ে সেরা।

রাণু গাঙ্গুলী বলে,—কি দিলে শুনি?

শুনবে কেন? দেখাচ্ছি।

বাণী সুবীরকে বলে,—আপনার প্রেজেণ্টেশন্ গুলো একবার দেখাবেন?

নিশ্চয়ই!

পাশে একটা ছোট ঘরে নিয়ে যায় স্থবীর।

ওর এক বিধবা বোনের জিম্মায় সব উপহার। একে একে দেখায় স্থবীর।

পিছন থেকে নুপুর দেখে।

এইটে মিস্ রয়, আর এটা পিসীমা, আর এটা সত্যেন।

রূপোর ছাইদানী। একটা রোলেক্স্ আর একসেট্ রবিঠাকুরের বই।

ওটা নবীন, ওই যে ওদিকে বীরেন দিয়েছে আর সামনের এটা অমলাদেবী।

মোটা ইংরাজী বই, সিগারেট কেস্ আর আর একটি ছোট্ট রেডিও।

নুপুরের কপালে ঘাম দেখা দেয়।

মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে।

এই নিন্। বাণী সেন বার করে ফুলদানী।

এটাও ধরুন। বিলিতি সিগারেট লাইটার দেয় রাম্নু গাঙ্গুলী।

নুপুর পালাবে কিনা ভাবছে।

এটা নিন্ ওটা নিন্। কত যে হাতে আসে স্থবীরের। নুপুর আর তাকায় না। তাকাতে ভয় করে ওর।

ওকি করে ছাই দুটো রুমাল দেবে এর মাঝখানে।

তাও একটু সেণ্ট মেণ্ট আনা হয়নি। সেণ্ট ত' বাড়ীতে নেই। কোত্থেকে থাকবে।

. তবু মরি বাঁচি করে রুমাল দুটি বার করে, কিছু বলতে পারে না। গলায় কথা আটকে যায়। ঘরের লক্ষ্মীর পট স্মরণ করে নুপুর, আমার মান রেখো ভগবান।

স্থবীর ওর মুখের দিকে তাকায়। কি বোঝে কে জানে। হঠাৎ বলে ওঠে,—বাঃ! নিজে হাতের কাজ করা রুমাল। কি সুন্দর!

রুমাল নিয়ে তথুনী পকেটে রাখে। মুখ মোছে।

নুপুরের চোখ দিয়ে জল বেরোবার উপক্রম।

সবাই বলে,—দেখি, দেখি।

রুমাল হাতে নেয়,—বাঃ বেশ কাজটি ত'?

শিখিয়ে দিতে হবে ভাই নুপুর।

কি নাইস্ পাতা দুটি তুলেচে।

কথাগুলো কানে আসে নুপুরের! নুপুর সকলের দিকে শুধু তাকায় আর কৃতার্থ হয়ে হাসে।

সুবীর সবাইকে ভেতরে ডাকে,—আসুন।

বিরাট দালানে চেয়ার টেবিল সাজান। তার ওপর ডিস সাজান।

সবাই বসে পড়ে। এক একটি গোল টেবিলে চারজন করে বসে।

কত খাওয়া! সিঙাড়া, নিমকি, রসগোল্লা, পেস্তার বরফি, চা' ত আছেই।

ঝুমুর বলেছিলো ঠিকই। খেতে খেতে ঝুমুরের কথা মনে পড়ে নুপুরের। ওর জন্যে মায়া লাগে।

দুটো পেস্তার বরফি যদি ওর জন্যে নেয়া যেত, কি খুসীই না হোত।

খাবার পর সুবীর সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বিদেয় করে।

ইচ্ছে করেই সবশেষে আসে নুপুর।

সুবীর নমস্কার জানায়,—আপনার দেয়া উপহার আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

—আমার সৌভাগ্য।—বলে হাসে নুপুর।

—আরও চারখানা যদি দান করেন।

—আচ্ছা সময় পেলে দোব। হাসতে থাকে নুপুর।

সুবীর চারদিকে তাকিয়ে বলে,—একটু বসুন না?

নুপুরের ইচ্ছে রয়েছে আর একটু থাকবার, আর একটু কথা বলবার সুবীরের সঙ্গে। তবু বলতে লজ্জা হয়। নুপুর আপত্তি জানায় খুব ক্ষীণভাবে,—রাত ত' অনেক হোল?

—হোক না। বসে তুজনে একটু গল্প করা যাবে।

—আজ না হয় থাক। আর একদিন আসব।

—আসবেন ত'? ঠিক?—সুবীরের চোখে মিষ্টি দুষ্টুমী। বেশ বুঝতে পারে নুপুর।

নুপুরও দুষ্টুমী করে,—ঠিক করে কি করে বলি!

—তবে বার্ড ইন্ হ্যাণ্ড ছেড়ে দেয়া কি ভাল? আজই না হয় চলুন বসিগে একটু।

সবাইকে বিদেয় করে নুপুরকে এত করে বসতে বলল, নুপুরের যেন ভারী ভালো লাগে। অমলাকে ত' থাকতে বলেনি এতকরে।

নুপুর মনে মনে খুব খুশী হয়,—একটা কথা যদি দেন ত' থাকতে পারি।

—কি কথা।

—একটি গান যদি শোনান।

সুবীর বলে,—আচ্ছা, আসুন!

—শুধু শোনান নয়, লিখেও দিতে হবে।

—আচ্ছা, তাও দেব। তবু আসুন।

নুপুর ভেতরে যায়। সেই ঘর। যে ঘরে প্রথমদিন এসেছিলো। ঘরের দোর খোলে সুবীর।

নুপুর ভেতরে গিয়ে বসে।

সুবীর নীল আলোটি জ্বালিয়ে দেয়।

বাড়ীটা নিঝুম হয়ে আসে ভেতর দিকে। সবাই চলে গেছে।

সুবীর গুণ গুণ করে গান ধরে।

মৃদু বাতাসে গান ভেসে আসে নুপুরের কানে।

ভারী সুন্দর। নুপুরের শুধু বসে থাকতেই ইচ্ছে হয় চুপ করে।

গান শোনায় সুবীর। নুপুর একটা কথাও বলে না। একবার ওঠেও না।

সুবীরও কথা বলে না।

শুধু চুপ করে থাকা।

তবু নুপুর যে মেয়ে, তার চমক ভাঙে। তাকে বাড়ী যেতে হবে। বাবা কি বলবে? কি বলবে মা? ঝুমুরই বা কি মনে করবে?

সুবীর খুব আস্তে বলে,—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—জীবনে আপনার ভালবাসা পেয়েছে এমন পুরুষ কেউ আছে কি?

নুপুরের বুক কাঁপে। এক রাজ্যের লজ্জা এসে ওর কণ্ঠরোধ করে।

তবু শেষ পর্যন্ত বলতে হয়,—আছে।

—কে? শুনতে পাব?

—না, শুনতে বারণ।—কি মিঠে গলা নুপুরের।

—কোনদিনও বলবেন না?

—যদি কখনও সময় আসে বলতে পারি। আজ উঠি।

—আমাকে ত' কিছুই শুধোলেন না?

নুপুর একটু থামে, হঠাৎ কিছু বলতে পারে না।

তারপর বলে,—একটা কৌতুহলই শুধু আছে।—

অমলা কি আপনাদের কেউ হয়?

সুবীর একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, প্রশ্নটা আশা করেনি। তবু বলে শেষ পর্যন্ত,—হ্যাঁ।

নুপুর আর কিছু শুধোতে পারে না। আরও কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল। কিন্তু পারে না। লজ্জা এসে ওর কথাকে চেপে ধরে।

কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছে নুপুর।

—এবার চলি।

সুবীরও যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বলে,—আবার কবে আসবেন?

—বলেন ত' কালই।

সুবীর হেসে ফেলে,—সামনের রোববার আসুন।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

বেরিয়ে আসে নুপুর।

রাত খুব কম হয়নি। একটু একটু শীত করে যেন।

আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চলে নুপুর। এলোমেলো বাতাসে চুল ওড়ে ওর কপালে থেকে মুখে।

ট্রাম রাস্তায় পৌঁছুতেই পাঁচ মিনিট। ট্রামগুলো বেশ ফাঁকা। একটা ট্রামে উঠে বসে পড়ে নুপুর! সুবীরের মন জানা গেল। তবু সবটা জানা গেল না।

নুপুর তবু পেয়েছে আজ অনেক। এত বেশী পেয়েও দিতে হয়নি বেশী কিছু। এইটেই নুপুরের সান্ত্বনা।

সুবীরের কথাগুলো কি মিষ্টি! কত উদার ওর মন!

নুপুর গরীব। এমন মরি মরি সুন্দরী কিছু নয়। তবু সুবীর কেন যে নুপুরকে এত পছন্দ করে, এত ভাল লাগে তার,—ভেবে নুপুরের চোখের কোনে জল আসে। ট্রামের দু' চারটি যাত্রীর নজরে পড়ে না যে ছোট্ট হাত রুমালে কোন ফাঁকে নুপুর চোখে কোন দুটো মুছে নিয়েছে।

নুপুরের জন্ম কোন লগনে হয়েছিলো কে জানে? সুবীরের ভালবাসা পাবার মত সৌভাগ্য নুপুরের হবার ত' কথা ছিল না। গরবিনী নুপুরের বুকটা তৃপ্তিতে আনন্দে ভরে ওঠে।

বাড়ী যখন ফেরে নুপুর তখন রাত খুব কম নয়।

বাবা বারান্দায় শুয়েছিলেন। মা-ও ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

নুপুর কড়া নাড়তে রবীন উঠে দোর খুলে দিলে। দাদা এত রাতেও জেগে আছে দেখে নুপুর একটু অবাক হোল। শুধোল একবার রবীন,—কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত ?

—একটা নেমন্তন্ন ছিলো দাদা।

বলে' পাশ কাটিয়ে চলে আসে নুপুর।

মা মেঝেতে শুয়ে আছে। রবীন ওপাশে।

ওদের পড়বার ঘরে এসে নুপুর হাত ব্যাগ রাখে। এইখানেই ওরা দু'বোন শোয়।

সাড়ী জামা ছেড়ে আটপৌরে সাড়ীখানা পরে।

ঝুমুর শুয়ে আছে ওর বিছানায়। ঝুমুরের সামনে একটা খাতা। খাতার একটা পাতা ছেঁড়া। পাতাখানা মোড়ান পড়ে আছে পাশে।

নুপুর এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে নেয়।

তারপর শুতে এসে আলো নেভাতে গিয়ে কি খেয়াল হয় ঝুমুরের মাথার কাছে মোড়া কাগজখানা তোলে। খোলে কাগজখানা।

কি আশ্চর্য! এযে ঝুমুরেরই লেখা।

লিখেছে ওই যে ছেলেটা আসে সেই বিমল তার নাম করে।

ঝুমুর যদি জেগে ওঠে। কি ভাববে ?

লজ্জায় সংকোচে বুকটা কাঁপলেও না পড়ে পারে না নুপুর।

ঝুমুরের জীবনের এক মধুর গোপন স্থান দেখে নেবার কৌতূহলকে ও দমিয়ে রাখতে পারে না।

কি পাকা মেয়ে! দিব্বি লিখেছে।

কেন মুখ শুকনো করে বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান? অমন রোগা হয়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন শুনি? সংসারে কিছু আপনাকে অমন করতে দেখলে কারো দুঃখ হতে নেই! জোর করে কি বলতে পারেন না কেন? অত ভীতু মানুষ সংসারে কিছুই পেতে পারে না। কাল আসতেই হবে ঠিক সন্ধ্যেবেলা, যখন সূর্য ডোবে-ডোবে অথচ ডোবেনি।

কি সুন্দর চিঠি!

চিঠিটা কি ঝুমুর সাধে লিখেছে! অমন চাপা মেয়ে, যার পেটের একটা কথা মুখে ফোটে না।—তার কলমে এত কথা অন্নে আসেনি।

সেই যে ঝুমুর কঠিন হয়ে বলেছিলো তার কিছুই বলবার নেই। কোন কথার তরংগ ওঠে না, ওঠে না কোন ভাব স্রোত তার মন সমুদ্রে বিমলের আকর্ষণে।

বিমল তার জীবনে ভাববার মত কোন বস্তু নয়।

কথাটা বিঁধেছিলো বিমলের মর্মে। ওর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। ও চলে গেল।

ঝুমুর জানত, সে কি বলেছে। কতখানি আঘাত করেছে বিমলকে। তবু এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সেই থেকে প্রায় কিছুদিন বিমলকে আর দেখেনি ঝুমুর।

গত কয়েকদিন হোল দেখছে বিমল তাদের বাড়ীর সামনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গলিতে। হয়ত লাল একটা রকে বসে গলির কোন একটা

ছেলের সঙ্গে ফাল্‌তো আলাপ করছে। চোখ দুটো কিন্তু বারে বারেই পড়ছে ঝুমুরদের জানালার দিকে।

কেমন যেন আনমনা চোখ। মুখখানা শুকনো। আরও রোগা হয়েছে।

কাঁধের হাড় দুটো জামার ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

ঝুমুর দেখেও দেখে না। কতবার ভবে কিছুতেই ওধারে যাবে না। তবু—বারে বারেই তাকে একটা না একটা কাজ করতে ওই জানালার ধারেই যেতে হয়।

হাতে হয়ত কুঁচিয়ে তোলবার কাপড় অথবা স্টোভ ধরাবার স্পিরিট।

ওধারে এত কাজ। বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। ভাবে ঝুমুর। নইলে যেতে তার বয়ে গেছে।

তা না হয় গেল। মুখটা খুব গম্ভীর করেই গেল।

কিন্তু দু'একবার তাকিয়েও ফেলছে। অবিশ্যি খুবই তাচ্ছিল্য করে তাকিয়েছে।

তাকিয়ে বুকটা কেমন মুচড়ে উঠছে কেন!

বিমলের শুকনো মুখখানা এক পলক দেখেই মনের পর্দায় বারে বারেই ভেসে ওঠে কেন!

মুখটা এত শুকিয়ে গেছে দেখে তার বুক অমন বাধে কেন।

কত চেষ্টা করলে ঝুমুর। কোথাকার কোন একটা ছেলে, ওর কথা না ভাবলেই নয়! যা খুসী হোকগে!

মরুক গে।

কিন্তু সত্যিই যদি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যায়!

ছাঁত্‌ কার ওঠে বুকের ভেতর।

বিমল মরে যাবে ভাবতেই মাথাটা কেমন কোরে ওঠে।

ঝুমুর কি করে জানবে যে ওর সবটুকু আনন্দ দুঃখ কবে কোন সময় থেকে বিমলকে ঘরে কল্পনা রচনা করে আছে।

বিমলের বেদনায় ওর বেদনা।

বিমলের আনন্দে ওর আনন্দ।

ঝুমুর নিজে নিজেই অবাক মানে। আর ত কঠিন হয়ে যায় না।

সন্ধ্যায় দিদি যখন সুবীরদের ওখানে গেল, ও একা একা পড়বার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভেবেছে। মেয়েদের এমন কষ্ট। মুখ ফুটে কিছু বলতেও যেন কিছুতেই পারা যায় না। অথচ না বললেও যে আর উপায় নেই। বিমলের শরীর খারাপ. কোন শক্ত অসুখ হয়ে পড়ে যদি। যদি অসুখ থেকে আর নাই ভাল হয়। তখন ত' ঝুমুর সইবার শক্তিও যে পাবে না।

বিমলকে সব বলাই ভাল। অভিমানে অনেক অনর্থ হতে পারে।

তবু একটা অভিমানই ওর সবচেয়ে বেশী করে বাধে। কেন বিমল জোর করলে, কেন বিমল ওকে বুঝল না। ঝুমুরের পাতলা ঠোঁট দুটি কাঁপে।

ময়লা সাড়ীর আঁচলে দুবার চোখ মুছতেও বুঝি হয়।

অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত ও এই লাইন দুটি লেখে।

লিখতে লিখতে নানা ভাব সংমর্দনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

রাত অনেক হোল। জানালার এলোমেলো বাতাসে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে।

দিদি এখনও এলো না।

ঝুমুর খাওয়া মিটিয়ে নিয়ে আবার চিঠিটা নিয়ে বসে।

চোখের পাতা আবার নেমে আসে।

কখন ঝুমুর ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই জানে না।

নুপুর আজ যেন ছোটবোনের বেদনার কিছুটা পরিমাণ করতে পারে। চিঠিখানা ঠিক জায়গায় রেখে ঝুমুরের মুখের দিকে তাকায়। ছেলে-মানুষ! বড্ড লেগেছে ওর প্রাণে।

ওর বেদনায় নুপুরের বুকটা ভার হয়ে ওঠে।

ঝুমুরের গায়ে ভাল করে সাড়ীটা জড়িয়ে দিয়ে একটু ওধারে ওকে শুইয়ে নিজে শুয়ে পড়ে।

শুয়ে ঝুমুরের গলাটা সস্নেহে জড়িয়ে ধরে চোখ বোজে।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙে নুপুরের। ঘুম ভেঙে দেখে ঝুমুর কখন উঠে গেছে। খাতাও নেই চিঠিও নেই।

ঝুমুর খুব ভোরে ঘুম ভেঙে দেখে দিদি তার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে উঠে পড়ে ঝুমুর। ওমা! কি কাণ্ড! চিঠিটা যে দিদির পাশেই পড়ে আছে। নিশ্চয়ই দিদি দেখেছে! যদি দেখে থাকে।

ভাবতেই ঝুমুরের কানদুটো রাঙা হয়ে ওঠে। খাতা আর চিঠিটা সরিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

বাবা ভোরে উঠে সন্ধ্যায় বসেছে।

মা এখনও ওঠেনি। দাদাও নয়।

উনুনে আঁচ দিতে চলে যায় ঝুমুর রান্নাঘরে। সন্ধ্যে করে উঠে বাবা চা চাইবে।

উনুনের ধোঁয়ায় চোখ মুছতে মুছতে ভাবে ঝুমুর যদি দিদি চিঠিটা দেখে থাকে, কি লজ্জায় যে পড়তে হবে। কখন যে দিদি এসেছিলো কাল রাত্রে, জানেও না ঝুমুর।

প্রমীলা দেবী উঠে আসেন।

বলেন ঝুমুরকে,—জলটা আজ তুলবি মা, গা গতর কেমন ধারা ব্যাথা করচে।

—জ্বর হয়নি ত'? শুধোয় ঝুমুর।

—না জ্বর নয়। কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করচে শরীল।

ঝুমুর কাজ পেলেই বাঁচে, পড়বার ঘরে দিদির সামনে আর যেতে হয় না তবে।

বলে,—তুমি শুয়ে থাকোগে যাও। সব করবখ'ন আমি।

—তুই একা কেন করবি। আমিও কি করতে জানিনা কিছু।—নুপুরের গলার স্বরে ঝুমুর চমকে তাকায়।

নুপুরকে দেখে ওর মুখটা ম্লান হয়ে ওঠে। নুপুর বলে,—ঝুমুর বালতী টা দে এগিয়ে জল নিয়ে আসি।

ঝুমুর আর কথা না বাড়িয়ে বালতী এগিয়ে দেয়।

প্রমীলাদেবী বলেন—যাক্ রান্না আমিই করবখ'ন। তোদের আবার ইস্কুল কলেজ কামাই হবে।

তাহোক। বলে নুপুর,—তুমি যাও দিকি। শোওগে যাও।

দুবোন যেন সাবিত্রী বেহুলা। কি মিল আজ ওদের!

দুবোনেই আজ রান্না সেরে কাজ সেরে খাওয়া মিটিয়ে পড়বার ঘরে এসে শুয়ে পড়ে।

ঝুমুরের কিন্তু ঘুম হয় না।

বেলা সাড়ে চারটের আগেই দুবার জানালার ধারে যায়।

নুপুর ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে হাসে।

ঝুমুরকে দেখে চোখ বোজে যেন ঘুমিয়ে আছে।

আরও মিনিট দশেক কাটে, আরও বার তিনেক কাজের অছিলায় ঝুমুরকে জানালার ধারে যেতে হয়। ওই ত' দেখা যাচ্ছে।

আহা, চুলেও তেল নেই।

কি যে চেহারার ছিরি হয়েছে। ইসারায় ডেকে ফেলে ঝুমুর জানলা দিয়ে।

বিমল তাকিয়েই ছিল। ওর ইসারায় এগিয়ে আসতে থাকে।

ঝুমুরের বুক কাঁপে। দিদি যদি জাগে।

মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সদরে আসে ঝুমুর।

বিমল সদরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

পরিষ্কার নির্বিকার স্বরে বলে,—ডেকেছিলে?

ঝুমুরের বুক দুর দুর করে, তীর বেঁধা পাখীর মত।

—কিছু বলবে?

জামার ভেতর থেকে ছোট্ট চিঠিখানি বার করে ঝুমুর।

বিমলের হাতে গুঁজে দেবার সাহসটুকুও নেই ওর।

ওর সামনে কাগজের টুকরোটা ফেলে দুম্ করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

এপাশে এসে ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে দেখে বিমল কাগজটুকু কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখে। একটু দাঁড়ায় কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করে।

সেরেছে। আবার দাঁড়িয়ে কেন? কেউ যদি এসে পড়ে।

কি বোকা! এখনও দাঁড়িয়ে?

বিমল এবার পিছন ফেরে। চলে যায়।

বাঁচা গেল। ঝুমুর চলে আসে ঘরে।

এসে দেখে নূপুর তেমনি ঘুমুচ্ছে। ও জানে না যে ঝুমুর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই নূপুর উঠে ঘরের জানলা দিয়ে সব দেখেছে।

ঝুমুর ভাবে, যাক্ খুব ঘুমোচ্ছে দিদি।

চুপ করে নূপুরের পাশে শুয়ে চোখ বোজে ঝুমুর। চোখ বুজলে কি হবে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিমলের প্রতিটি প্রত্যংগের ছবি।

বিমল কেমন করে চিঠিখানা পড়বে। পড়ে কি ভাববে! যদি কাল না আসে।

বয়ে গেল। তার কর্তব্য সে করেছে। একটা ছেলে তার দোষে শুকিয়ে মরবে, এটা ত' আর সে দেখতে পারে না বসে বসে। তাই কর্তব্য সেরেছে। তারপর আসে আসবে, না আসে না আসবে।

চিঠিটা দিয়ে সে কি খেলো হয়ে গেল। না, খেলো হবার কি আছে ওতে। তবু চিঠিটা লেখা বোধ হয় ঠিক হয়নি। যা মনে এসেছে, লিখেছে, তা-ও কত গোপনে কত সন্তর্পণে লিখতে হয়! লেখবার জন্যে পুরো একটা বেলা যদি সময় পাওয়া যেত!

আর ভাববে না সে ওসব কথা।

ইস্কুলের কথা ভাববার চেষ্টা করে ঝুমুর।

ইস্কুলের দীপ্তি শুধু ওর কথা সব জানে। দীপ্তির কথাও ত জানে। দীপ্তির এক দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। আসে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ী। ভাল হকি খেলতে পারে। তার নাকি ছবি আর নাম বেরোয় খবরের কাগজে।

দীপ্তিটা বড় খেলো। হল্ হল্ করে কথা বলে। ছেলেটার জন্যে পাগল।

ঝুমুর তার নিজের কথা বেশী কিছু বলেনি। তবু বলেছে বিমল নামে একটি মানুষ আছে, তাহার বয়স বাইশ বৎসর।

মনে মনে হাসে ঝুমুর।

বিমলের রোগা চেহারাটা কেমন একটা মিষ্টি অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, ওইটেই ঝুমুরের সবচেয়ে ভাল লাগে। ঠিক এই ভাবটা সে আর কোন ছেলের ভেতর দেখতে পায় না।

এই সেরেচে। দিদি নড়ছে।

নুপুর চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে উঠে বসে।

ঝুমুর তেমনি চুপ করে চোখ বুজে পড়ে থাকে।

নুপুর ডাকে,—এই ঝুমুর ওঠ। বেলা যে পড়ে এলো। ওঠ।

মোড়ামুড়ি ভাঙে ঝুমুর। যেন কত গভীর ঘুমে ছিল সে।

নুপুর ঠেলা মারে।

ঝুমুর সাড়া দেয়,—উঠছি।

ত্ব'বার উঠে আবার কাজে লেগে যায়।

পরদিন নুপুর কলেজ যায়। ঝুমুর যেন বাঁচে। বাবা বেরোয়। দাদা বেরোয়। মা খাওয়া মিটিয়ে গড়াতে থাকে মেঝেয়। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আটটার আগে আসবে না কেউ। বাঁচা গেল!

ঝুমুর কিছু আগেই ইস্কুল পালিয়ে চলে আসে।

বাড়ীতে আসবার পথেই গলির মোড়ে বিমলকে দেখতে পায়।

আজ যেন বিমল খুব খুসী খুসী।

ঝুমুরের কানত্বটো রাঙা হয়ে ওঠে। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। কি যে ঝুমুরের স্বভাব। বিমলের সামনে পড়লেই ওর ভয় করে। বুক কাঁপে।

পুরুষ মানুষ! ওদের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কখন হঠাৎ কি করে বসবে। কে দেখে ফেলবে। ভয় হয় ঝুমুরের অকারণে। বিমল সামনে এসে বলে,—চলো।

ঝুমুর জবাব দিতে পারে না। পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। কি বেহায়া বিমল। রাস্তার মাঝখানে কথা বলে বসলো।

বিমল কিন্তু তবু আবার বলে,—চলো।

ঝুমুর ওর দিকে না তাকিয়ে বলে,—কোথায়?

—চলো না। জাহান্নমে নয়।

ঝুমুর ইতস্তত করে।

বিমল মিষ্টি হেসে বলে, ভয় নেই। কেউ দেখবে না।

—কিন্তু দেরী হবে যে—! অসহায়—কণ্ঠে বলতে চায় ঝুমুর।

—কিছু দেরী হবে না। আমাদের নতুন একটা বাড়ী হচ্ছে, সেখানে চলো।

আর উপায় কি! বিমল যেমন করে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। যদি দিদি দেখে ফেলে! কিংবা দাদা! ঝুমুর অগত্যা ওর সঙ্গে এগোয়।

হন্ হন্ করে ওরা এগিয়ে চলে।

বিমলরা কলকাতার বনেদী ঘর। পড়তি অবস্থা।

তবু অন্য পাড়ায় ওরা বাড়ী করছে। জায়গা কেনা ছিল ঠাকুর্দার আমলে।

সেই পাড়ায় গিয়ে ছোট একটা দোতলা বাড়ীর ভেতর ওরা ঢোকে। নোতুন বাড়ী। এখনও শেষ হয়নি।

ঝুমুর বিমলের পেছন পেছন একটা ঘরে যায়।

একখানা মাদুর পাতা আছে। বিমল বোধ হয় আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছে।

ঝুমুর ঘরের সামনে এসে ভয়ে ভয়ে বলে,—আমি বরং যাই।

—ভয় নেই। হেসে ফেলে বিমল,—বোস।

ঝুমুর যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় বসে পড়ে। একা একা বিমলের সংগে ওর খুব ভয় করে।

কিছু একটা বলতে হবে বলে,—এ বাড়ী কি আপনাদের?

—আমাদের নয়। আমারই বলতে পারো। আমার ত' ভাই আর নেই। তিনটি বোন। বিয়ে হয়ে গেছে।

—যে বাড়ীটায় ছিলেন ওটা কি হবে ?

—ওটা ত' বাবার দেনা শোধ করতে বিক্রি করতে হোল। ওটা অনেক বড় বাড়ী। ভাড়া পেতুম যা' তাইতেই ত' সংসার চলত।

—এ বাড়ীও কি ভাড়া দেবেন ?

—বলতে পারি না। চাকরী ত' আছে। ভাড়া না দিতে পারি।

—কখন অফিসে বেরোন।

—ঠিক নেই কিছু। কোনদিন না বেরোলেও চলে। বিল কলেক্টরের কাজ। অতি অল্প মাইনে।

বিমল কি সুন্দর সত্যি কথা বলে। নিজের অবস্থা ঢাকবার একটুও চেষ্টা নেই।

ঝুমুর আবার উস্‌খুস্‌ করে,—আমি তা হলে চলি !

—হ্যাঁ যাবে। কয়েকটা কথা আছে।

—কি ?

বিমল পরিষ্কার গলায় বলে,—কথাটা কিছুই নয়। তোমাকে যদি বিয়ে করতে চাই। তোমার বাবা মায়ের কি আপত্তি হবে ?

সেরেছে ! ঝুমুর ভয়ে জড়োসড়ো। কি বলবে ও !

বিমল বলে,—আমার মায়ের আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমাদের জাতে ত' আটকাবে না !

ঝুমুর নীরব।

—আমি কি তোমার বাবা মাকে বোলব ?

ঝুমুর এতক্ষণে কথা বলে,—এখন নয়। যখন সময় হবে, জানাবো।

বিমল বলে,—আমি তা হলে অপেক্ষা কোরব ?

ঝুমুর কথা বলে না।

তোমার কিছু আপত্তি আছে ?

আপত্তি! বিমল কি জানে না! তার সংগে এক অনূঢ়া অবিবাহিত মেয়ে একা একা চলে এলো। কেন? কারণটা কি এখনও পরিষ্কার করে বলতে হবে? রাগ হয় ঝুমুরের।

ও বলে,—আমি এখন যাই।

—একবার মুখে বলো না! বিমলের কণ্ঠে আবেদন,—যা শুনতে চাই মুখে বলতে ঝুমুর পারবে না। কিছুতেই না। ওর কণ্ঠরোধ হয়ে যায়।

ঝুমুরের হাতের তালু ঘেমে ওঠে।

বিমল ডাকে,—ঝুমুর!

ঝুমুর একবার তাকায়। ওর কপাল ঘেমে ওঠে।

—তুমি কি বোবা?

ঝুমুরের ইচ্ছে হয় বলে, বোবারও ত মনের ভাষা আছে। কে বুঝতে পারো না।

বিমল বলে খুব আস্তে আস্তে,—একবার বলবে না ঝুমুর, এক কিছু কথা?

নির্জন বাড়ীটা থম্‌থম্‌ করে। ঝুমুর চুপ করে বসে থাকে।

অনেক পরে বলতে পারে শুধু,—বুঝতে পারো না?

আনন্দে বিমলের চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে ওঠে। তবু ভাব গম্ভী বিমল ফস্ করে কিছু করে বসে না। চুপ করে থাকে। ঝুমুরকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিয়ে।

ঝুমুর একটু পরে বলে,—একটা কথা ছিল।

—কি?

—আপনি আমাদের বাড়ী বেশী আসবেন না।

—কেন?

—দিদি কিছু মনে করতে পারে।

—করলেই বা। আমি ত' চুরি ডাকাতি করিনি।

ঝুমুর কথা বলে না। বিমলের কথার জবাব দেয়া শক্ত। তবু বিমলকে ও কি করে বোঝাবে যে তার লজ্জা করে। কি যে ছাই লজ্জা!

বিমল বলে আবার,—তোমার দিদি কি কলেজে পড়েন?

—হ্যাঁ।

—তবে ত' তাঁকে ভয় করবার কোন কারণই নেই।

ঝুমুর আবার নীরব।

বিমল আপন মনেই হাসে,—একটা মজার কথা শুনবে?

ঝুমুর জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

বিমল মৃদু হেসে বলে,—দেখা হলে কত কথা বলব ভাবি। কথার বোঝা বুক থেকে গলা পর্যন্ত কিল্‌বিল্‌ করে। কিন্তু সামনে এসে কোথায় উড়ে যায়। একটা কথাও আবার সময় মত মনে পড়ে না।

ঝুমুরেরও তাই।

কত লাখ লাখ কথাই ত' বলবার আছে। কিন্তু কই একটা কথা বলতেই যে ঘেমে উঠতে হয়।

নির্জন বাড়ীটায় আবার ঝুমুরের কেমন ভয় ভয় করে!

—এবার উঠি।

বিমল ওঠে,—হ্যাঁ, চলো উঠি।

ঝুমুর তাড়াতাড়ি বলে,—না, না, আপনি না হয় বসুন, একাই যেতে পারব।

বিমল বোঝে, হাসে, বলে,—ভয় নেই। সংগে যাব না। অন্ততঃ দশ হাত তফাৎ রেখে চলব।

ঝুমুর আপত্তি জানায়,—না তা বলিনি—মানে—।

বিমল ওঠে—চলো।

বাড়ীটা থেকে বেরোয় ওরা। বিমল আস্তে আস্তে হাঁটে।

ঝুমুরকেও বাধ্য হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হয়

বিমল বলে,—এগিয়ে যাও।

বেঁচে যায় ঝুমুর। অনেকটা এগিয়ে যায়।

বিমল অনেকটা পিছন পিছন চলে।

আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলো শিশিরকণা! বেলা তখন আটটা হবে। শিশিরকণা কলতলায় ছিল। স্নান সেরে দু' বালতী জল নিয়ে ওপরে উঠবে। রান্না চাপাবে।

বাজার দোকানটা ধীরেনবাবুই করে দেয়। মধুসূদন বলে গিয়েছিলো, ওরা একা রইল। একটু দেখবেন।

ধীরেনবাবু মধুসূদনের কথার মর্যাদা রেখেছে। নিজে সেধেই বলে, ফুলমণি, ও ঘরের বৌয়ের বাজারের পয়সাটা চেয়ে আনিস।

ফুলমনি একআধ সময় ঝংকার তোলে,—আমাদের কি মাথা ব্যথা শুন! যার বাজার সে পয়সা দিয়ে যেতে পারে না।

সমরেন আবার খোঁচায়,—যা না। দাদা বলছে, কথা অমান্য করচিস্ কেন?

গজ্ গজ্ করতে করতে ফুলমণিকে যেতে হয়।

—কই গো বৌদি বাজারের পয়সা!

শিশিরকণা হয়ত বলে, আজ থাক ভাই। পালং আছে। দুটো বেগুন আছে। নেড়ে নোবখ'ন!

আবার কোনদিন একটু মাছও আনতে দেয় নিজের জন্যে আর শ্বাশুড়ীর জন্যে আলু।

আজ বাজার কিছু নেই। জল তুলতে তুলতেই ভাবে শিশিরকণা। ভাতে ভাত যা হোক কিছু করে নেবে আজ। রোজ রোজ পরকে বাজারের কথা বলা আর ভাল লাগে না!

বালতী ভরে আসে।

তাড়াতাড়ি করে শিশিরকণা। এর পর নাইতে নামবে ওপরের মহারাণী অর্থাৎ দেবযানী। বেশ আছে।

কোনদিন রেঁধে খায় দেবযানী। কোনদিন বা স্নান করে বেরিয়ে যায়। কোথায় হোটেল—মোটেলে খেয়ে নেয় হয়ত। জাত বেজাত বিচার ত' নেই। ধিং ধিং করে বেড়াচ্ছে দিনরাত।

ঠোঁট দুটো আপনা আপনি উল্টে আসে শিশিরকণার।

তারপর আবার ফুলমণি।

ভোরে স্নান সেরে জল নিয়ে গেছে। আবার নামবে সাড়ে নটা দশটায় ধীরেনবাবুর আর সমরেনের খাওয়া শেষ হলে বাসন মাজতে।

তাছাড়া নুপূর ঝুমুর তাদের মা তাদের ভাইয়ের স্নান। ওদের বাবা অবিশ্যি স্নান করে না বললেই। বছরে একবার স্নান করে। তাও গরম জলে। সেদিন যেন উৎসব। উকীলবাবুর স্নান মহাঅষ্টমীর দিন। গরম জলে কাক স্নান করে অঞ্জলি দিতে যান।

গা দিয়ে কি গন্ধও বেরোয় না গা!

শিশিরকণার নাক কুঁচকে ওঠে!

দু বালতী প্রায় ভরে এলো।

দেবযানীর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নেমেছেন মহারাণী!

দেবযানী কলতলার দোরের কাছে আসতেই একগাল হেসে বলে শিশিরকণা,—একটু সবুর ভাই। বালতী দুটো নিই।

দেবযানী দাঁড়ায়।

শিশিরকণা বেরোবার রাস্তা পায় না, যদি দেবযানীর ছোঁয়া লাগে। জাত বেজাত কত রকম মানুষের সংগে মেশে, কত রকম মানুষের হাতে খায়। ওর ছোঁয়া কি খাওয়া যায়। হাজার হোক্, শিশিরকণা বামুনের মেয়ে।

একটু হেসেই বলে,—কিছু মনে করোনা ভাই শাউরীর আবার ছুঁচি-বাই—মানে একটু যদি সরে দাঁড়াও।

দেবযানী—নিশ্চয়ই—বলে একটু মুচ্‌কী হেসে সরে দাঁড়ায়।

এর ভেতর দোরে কড়া নাড়ার শব্দ।

দেবযানী দোর খোলে।

ওমা! এ কে! মধুসূদনকে দেখে ঝুম করে বালতী রেখে ঘোমটা টানে শিশিরকণা।

কিন্তু স্নানের পরে ভিজে সাড়ী গায়ে লেপ্‌টে গেছে। ঘোমটা ওঠে না।

দেবযানী অবাক,—কি হোল বৌ।

মধুসূদন দেবযানীকে দেখেনি। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভারী সুন্দর মেয়েটি ত! শিশিরকণা লক্ষ্য করে।

ফিস্ ফিস্ করে বলে ওঠে,—এসো ওপরে।

হাতে কম্বল আর সুটকেস্।

মধুসূদন শিশিরকণার পিছু পিছু ওঠে, কিন্তু ওরি ভেতর আরও একবার পেছন ফিরে দেবযানীকে দেখে নেয়। এটাও শিশিরকণার চোখ এড়ায় না। দু বালতী দু হাতে নিয়ে সে স্বামীর ওপর নজরটা ঠিকই

রেখেছে ওপরে উঠে মধুসূদন শুধোয়, মা কই ?

কথা না বলে আঙ্গুল দেখিয়ে দেয় ঘরের দিকে শিশিরকণা।

মধুসূদন ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে।

বুড়ী মদনমোহন তলায় যাবার উদ্যোগ করছিল। ছেলেকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে। চোখে জল দেখা দেয়।

মধুসূদন ঠাণ্ডা স্বরে বলে,—ছাড়ো মা। বসি।

—বোস বাবা। এতদিন পরে মাকে মনে পড়ল।

মধুসূদন বসে।

খাট মানুষটি মধুসূদন। মাথার চুল উঠে গেছে অনেক, পাতলা হয়ে এসেছে। নাকে চোখে মুখে এক ভালোমানুষী নিরীহ ভাব। চোখদুটি ছোট স্তিমিত যেন ঘুম ঘুম সবসময়ই। সরু গলা। আস্তে কথা বলে।

—অনেক বলে কয়ে পনেরো দিন ছুটি পেয়েছি।

বুড়ী বলে,—মোটে পনেরো দিন, একমাসের আগে ছাড়চি না।

মধুসূদন চুপ করে হাসে।

—বলি অ বৌমা, মধুকে তেল গামছা দাও। একবারে চান করে আসুক না হয়।

শিশিরকণা পাশ থেকে শোনে, জবাব দেয় না,

—কি হোল গো! কালা হলে নাকি ?

রাগে শিশিরকণার গা জলে। ছেলেকে দরদ দেখানো হচ্ছে।

মধুসূদন মৃদু কণ্ঠে বলে,—থাক্, থাক্, দোবখ'ন। একটু জিরুই আগে।

বৌয়ের পক্ষ হয়ে মধুসূদনের কথাটা বুড়ীর একটুও ভাল লাগে না।

বলে,—বেশ ত' জিরো না তুই, তা বলে চানের জোগাড়টা করে রাখতে দোষ কি শুনি! ছ্যাঃ ছ্যাঃ আমার একটা কথাও গেরায্যি করে না গা।

মধুসূদন মাকে থামাবার জন্যে বলে,—টাকাটা রাখোত' !

মায়ের হাতে কয়েকখানা দশটাকার নোট তুলে দেয় ।

শিশিরকণা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে নোট ক'খানা । মনে মনে ভাবে, দেখো লোকদেখানো একটু দরদী কথায় ছেলে কেমন ভিজে গেল । তুলে দিলে সব কটা টাকা মায়ের হাতে ।

একটু পরে স্নানের তেল গামছা নিয়ে ঢোকে শিশিরকণা ।

মধুর সামনে রেখে নীরবে চলে যেতে চায় ।

শ্বাশুড়ী ছাড়বার মানুষ নয়. বলে,—কোথা যাচ্ছ। একটু মাছ আনাও না কাউকে দিয়ে !

শিশিরকণা এবারেও কথা বলে না ।

বৃদ্ধা জলে ওঠে,—দেখ্‌চিস্‌ বাবা, যেন কুকুর ভেউ ভেউ করছে, একটু মান্যি নেই, একটু ইয়ে নেই । কি সুখে যে আছি একবার দেখে যা ।

শিশিরকণা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় একটুখানি রান্নার জায়গায় গিয়ে বসেছে ।

মধুসূদন শিশিরকণার ব্যবহারে সত্যিই একটু বিরক্ত হয় ।

তবু বেশী কিছু বলে না ।

স্নান সেরে খেতে বসে মধুসূদন ।

নিরামিষ খাওয়া ।

বুড়ী বলে,—তখন যে বলা হোল একটু মাছ আনাতে ।

শিশিরকণা গলার ঝাঁজ নিয়ে বলে,—আমি কি বাজারে বেরোব । কে আনবে ?

—শুনলে কথার ছিরি ! শোন বাবা একবার শোন কি কথার উত্তর কি কথা !

মধুসূদন এবারে আস্তে বলে,—হয়ত' আনাবার লোক পায়নি ।

—না লোক পায়নি? বাড়ীতে পঞ্চাশ গণ্ডা মানুষ গিজ্ গিজ্ করচে। লোকের অভাব বললেই শুনব কিনা?

নীরবে ভাত খায় মধুসূদন। এই ধরনের ব্যাপারগুলো এড়াবার জন্যেই সে আজ স্ত্রীকে নিয়ে বাসা পর্যন্ত করেনি। কদিনের জন্যে এসেও সেই কাণ্ড কারখানার সূচনা। কিছু না' বলে খেয়ে ওঠে মধুসূদন।

দুপুর কেটে যায়।

বিকেলও।

বুড়ী কোথাও বেরোয় না। শিশিরকণাও মধুসূদনের সংগে একটা কথা বলবার সুযোগ পায় না। বলেও না। মধুসূদন কথা বলবার কোন ফাঁক পায় না।

সন্ধ্যায় ফুলমণি বেড়াতে এসেছে।

—কিলো বৌদি। একজন এসেচে শুনলুম।

শিশিরকণা মুচকী হাসে।

ফুলমণি ঘরে ঢোকে। মধুসূদন চিঠি লিখছিল, বোধহয় জব্বলপুরে কোন এক বন্ধুকে। মুখ তুলে তাকায়।

মোটা সোটা মেয়েটাকে দেখে একটু উঠে বসে।

ফুলমণি বলে,—চিনতে পারবেন না। আপনি ত' বেশী আসেন না।

মধুসূদন একটু হেসে বলে,—হ্যাঁ, প্রায় বছর দেড়েক—।

ফুলমণি বলে,—ধীরেন বাবুর স্ত্রী আমার দিদি ছিল। তিনি মারা যাবার পরই আমি এসেচি!

—অ! বলে সায় দেয় মধু।

ফুলমণি হাসে ফিক্ করে,—কি মানুষ বলুন ত' আপনি। বৌদিকে ছেড়ে দিব্যি রইলেন। বৌদির কি কষ্ট যদি দেখতেন—।

—কার কষ্টরে —বলতে বলতে নীচের তলা থেকে বুড়ী এসে হাজির।

মধুসূদন চুপ করে যায়।

ফুলমণি কথা ঘোরায়,—এই আপনাদের কষ্টের কথা বলচি। দাদা ত' এ মুখো হবেন না!

বুড়ী বিড় বিড় করতে করতে সন্ধ্যে করতে বসে।

মধুসূদন আবার চিঠি লেখায় মন দেয়।

ফুলমণি বাইরে আসে।

—অ বৌদি! কোথায় শোবেন আজ। ঘর ত' একটা।

শিশিরকণা তরকারী নাড়তে নাড়তে বলে,—মায়ে পোয়ে ঘরে শোবে আমি এই রান্নাঘরে।

—তা কখনো হয়? কক্ষনো নয়। আমি এসে শোবার ব্যবস্থা করে দোব।

শিশিরকণা ফুলমণির ওপর মনে মনে ভারী খুসী হয়, কিন্তু মুখে বলে,—তুমি আর কি করবে ভাই। জায়গা ত' নেই।

—বুড়ীকে রান্নাঘরে দোব।

শিশিরকণা হেসে ফেলে,—তবে আর রক্ষে নেই। চেঁচাবে—ছেলেবৌ আমার ঘর থেকে বার করে দিয়েছে।

ফুলমণিও হাসে, হেসে বলে, —দেখো না, পারি কিনা।

—তোমার দাদাও হয়ত রাজী হবে না।

—খুব হবে। তুমি চুপ করে কাজ করো দিকি। আমি আবার আসব। বলে ফুলমণি চলে যায়। ধীরেনবাবু এসে পড়বে, সমরেনও।

শিশিরকণা একা একা একটুখানি ঘেরা বারান্দায় বসে বসে রান্না করে। আকাশ পাতাল ভাবে।

কবে যে এই শ্বাশুড়ীর হাত থেকে মুক্ত হবে সে কে জানে।

দীর্ঘ আঠারো মাস পরে দেখা' তবু সে দেখাও হয়ত পূর্ণ হতে পাবে না। হয়ত ভাল করে দুটো কথা বলবারই সুযোগ হবে না। দিনের পর দিন অসহনীয় প্রতীক্ষার কি শেষ নেই ?

উনুনের আঁচ লাগে শিশিরকণার চোখে মুখে।

কপালের চুল সরিয়ে গালের ওপর থেকে চোখের জল মুছে নেয়। কেউ জানে না। ঈশ্বর জানে শিশিরকণার বেদনার পরিমাপ। বোবা বসন্তের চাপা গুঞ্জন কান্না হয়েও বেরুতে পথ পায় না। বৃথা যৌবনের আক্ষেপ, বসন্তের জ্বালা এ যেন ওর জীবনের অর্থহীন অভিশাপ। আর বইতে পারে না শিশিরকণা। এর চেয়ে মরাও যে অনেক ভাল।

আবার চোখদুটো মুছে কড়া তুলে দেয় উনুনে।

—কিগো শুনছ ?

আচমকা ডাকে তাকায় শিশিরকণা। মধুসূদন এসে দাঁড়িয়েছে কোন ফাঁকে তার পেছনে রান্নাঘরে। শ্বাশুড়ীর সন্ধ্যে বোধ হয় শেষ হয়নি।

শিশিরকণা উত্তর দেয় না।

টপ্ টপ্ করে গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে মাটির উনুনের গায়ে। আতপ্ত মাটিতে মুহূর্ত্তে শুকিয়ে যায় চোখের জল। ওর মনের তাপে শুকিয়ে ওঠে বসন্তের যৌবন রস সঞ্চয়।

কি যেন কেন আর ভাল লাগে না মধুসূদনের ডাক। চোখে রঙ ধরে না। রঙ ধুয়ে গেছে অশ্রুবিন্দুতে।

মধুসূদন লক্ষ্য করে ওর গালের ওপর চোখের জলের দাগ।

কি যে করবে সে ঠিক করে উঠতে পারে না। নিজেকে যেন একটু অপরাধী মনে হয়। আসবার পর থেকে একটা কথাও ত সে বলেনি শিশিরকণার সংগে। দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছিলো হয়ত তার

আসবার জন্যে অথচ এসে যদি একটা মধুর কথাও না বলা যায়, তবে সত্যিই ত মনে লাগে। লাগে বই কি!

কিন্তু শিশিরকণা কি বোঝে না কেন সে একটা কথাও বলতে পারেনি?

ওকি চেনে না তার মাকে?

শিশিরকণা কি জানে না যে তার সংগে কথা বললে অনর্থক অনর্থ বাধিয়ে বসবে মা। অকারণে কাঁদবে, চেঁচাবে, নানা ছুতোয় দোষারোপ করবে ছেলের, আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকবে নিতান্ত অবুঝের মত।

ভয় করে মধুসূদনের। মায়ের এই অর্থহীন প্রলাপ আর কান্নার অর্থ বোঝবার অনেক চেষ্টা করে এইটুকুই মাত্র টের পেয়েছে মধুসূদন যে শিশিরকণাকে অবহেলা করলে মা ভারী খুসী।

তাই হয়ত অবহেলার ভাব দেখাতে হয়, অভিনয়ের মত।

এ অভিনয়টুকু শিশিরকণার বোঝা উচিত ছিল।

মধুসূদনেরও অভিমান হতে পারে। একদিন পরে এসে যদি মায়ের চীৎকার থামাতে গিয়ে স্ত্রীর কান্না, আর স্ত্রীর কান্না থামাতে গিয়ে মায়ের চীৎকার শোনে, তারপর অবস্থাটা কি হয়।

শিশিরকণার কি একটুও বুদ্ধি নেই!

মধুসূদনের দিকটা একবার তাকিয়ে দেখবার সময় পেলো না। বুঝল না যে মধুসূদনেরও প্রাণে ভালবাসা থাকতে পারে। জব্বলপুরের রুক্ষ আবহাওয়ায় বার বার মনে পড়েছে শিশিরকণার মুখখানা। কত মধুর মনে হয়েছে শিশিরকণার স্বপ্ন। ওর পাতলা ঠোঁট দুখানির ফাঁকে অপরূপ হাসি কল্পনা করেছে মধুসূদন, মেসে বসে একা একা।

তাই ত' আজ তাকে ছুটে আসতে হয়েছে একবার।

এই কথা কাকে শোনাবে মধুসূদন, কেই বা বুঝবে ?

মধুসূদনের কাছে শিশিরকণা যে কতখানি তার পরিমাপ মধুই জানে, আর কেউ জানে না।

জানবার উপায় নেই।

মায়ের ভয়ে মধু কিছুই প্রকাশ করতে পায় না।

তার কাছে মা-ও যে অনেক।

মাকে কষ্ট দিতেও যেমন বাধে, শিশিরকণার বুকের বেদনা তেমনিই অনুভব করে, অসহায় অবস্থায় পড়ে শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করবার সাধ্য তার নেই।

মধুসূদনের ইচ্ছে শিশিরকণা বুঝুক, একটু সয়ে যাক।

সময় চলে যায়। এ সময়ও চলে যাবে। নোতুন কোন সময়ের প্রতীক্ষা করে থাকুক।

এটুকু ধৈর্য শিশরকণার কাছে আশা করাও কি মধুসূদনের অন্যায় ?

মধুসূদন উনুনের পাশে শিশিরকণার রাঙা মুখখানার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে।

শিশিরকণা একমনে রান্না করে।

খুব বেশী মনোযোগ। একজনের উপস্থিতিকে ভোলবার জন্যে এক দৃষ্টে কড়ায়ের দিকে তাকিয়ে কুঁচো কুঁচো আলু ভাজা নাড়তে থাকে।

চোয়াল দুটো ওর কঠিন দেখায়। ঠোট দুটো চাপা।

গালের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে আবার ভাজা নাড়ে।

আর সইবে না শিশিরকণা।

মধুসূদনের বোঝা উচিত যে সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

বিয়ের পর থেকে কটা দিন সে মধুসূদনের সান্নিধ্য পেয়েছে ?

কটা দিন মধুসূদন তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলেছি ?

কি দিয়েছে আজ পর্যন্ত ?

চাকরী যখন ছিল না, তখন গয়নাগুলো সব বেচে সংসার চালিয়েছে। একটা কথাও বলেনি শিশিরকণা। হাসিমুখে গয়নাগুলো দিয়েছিলো। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শাশুড়ীর সব গঞ্জনা সয়েছে।

ভেবেছে তবু স্বামীর মনটা ভাল থাক।

যখনই স্বামীর অসহ্য হয়েছে মায়ের বিসদৃশ ব্যবহার, শিশিরকণাই স্বামীকে থামিয়েছে, বুঝিয়েছে, বুড়ো মানুষ, যাকগে যাক্। অমন একটু হয়, তুমি চুপ করো। মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কত রাতের পর রাত শিশিরকণাকে একা রান্নাঘরে ফেলে মধুসূদন মায়ের কাছে শুয়েছে, শিশিরকণা একটা কথা বলেনি, বিনিদ্র রাতে কেঁদে কেঁদে বালিস ভিজিয়েছে তার সাক্ষী আজ কেউ নেই। তবু একবারও স্বামীকে বলোন তার বেদনার কথা।

মধুসূদন কি একবার খোঁজ নিয়েছে, কাল রাতে কেমন ঘুম হোল তোমার ?

কিছুই বলেনি।

পরদিন যথারীতি রান্নার তাগাদা করেছে। শিশিরকণাকে হেঁসেলে ঢুকতে হয়েছে।

দিনের পর দিন কাছাকাছি থেকেও ওর সংগে একটা কথাও বলোনি মধু। শিশিরকণা বুক ভরে উঠেছে অভিমানে, তবু একটুও জানায়নি, যাক্। তবু মধুসূদনের মন ভাল থাক।

শান্তিতে থাক।

কিন্তু সারা জীবনই কি সয়ে যেতে হবে ?

এরা কি একবার ভাবেও না কতখানি সয়েছে শিশিরকণা। এই ব্যবহারই তার আজীবন পেতে হবে। বিনা প্রতিবাদে অত্যাচার সইলে

তার পরিণাম এই-ই দাঁড়ায়। সবাই ভাবে এর প্রাণ নেই, মন নেই, শুধু কাজ করতে এসেছে এ সংসারে।

শিশিরকণা আর সইবে না। কিছুতেই নয়।

—ভাজাটা যে পুড়ে গেল ?—খুব আস্তে বলে মধুসূদন।

সত্যিই ভাজাগুলো পুড়ে উঠেছে। খেয়াল ছিল না শিশিরকণার।

পুড়ুক।

সব জ্বলে পুড়ে যাক।

মধুসূদন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

শিশিরকণার কাণ এড়ায় না। ভাজাটা নামায় ও উনুন থেকে।

আঁচলটা সরে যায়—এক ঝলক বাতাসে।

মাথাটায় যন্ত্রণা হয় শিশিরকণার। ছিঁড়ে পড়ছে যেন।

মানুষটার পাশে বসে আছে এখনও।

অসহ্য লাগে ওর। কেন কে জানে।

মধুসূদন বলে, একটা কথাও বলবে না ?

ভারী করুণ শোনায় মধুসূদনের কথাটা।

তরকারীতে হলুদ মাখতে মাখতে তবুও বলতে হয় শিশিরকণাকে, না।

—এত রাগ ?

রাগ! রাগ কার ওপর করবে শিশিরকণা।

রাগ করবার মত মানুষ আছে নাকি কেউ ?

নীরবে কড়াটা আবার চড়িয়ে দেয় উনুনের ওপর। গরম তেলে তরকারীটা সাঁতলাতে থাকে।

মধুসূদন তবু অপেক্ষা করে।

মায়ের সন্ধ্যে বোধ হয় হয়ে এলো। হয়ত এখনি ডাকবে, চেঁচাবে। বাইরে চলে আসবে।

কেমন একটা ভয় হয় মধুসূদনের।

কেনই বা ভয়? নিজেই ভেবে অবাক হয় মধুসূদন কেন ও এত ভয় করে। বিবাহিতা স্ত্রীর সংগে দুটো কথা বলবার অধিকারও তার নেই?

এত ভয় কিসের? সে ত অন্যায় কিছু করছে না?

বসেই থাকে মধুসূদন।

ঠিক ডাক আসে,—অ বউমা। মধু কোথা গেল?

শিশিরকণাও যেন ভয়ে ভয়ে তাকায় মধুসূদনের দিকে, অর্থাৎ যাও, মা ডাকছে।

উঠবে না ও।

আবার ডাক আসে চড়া স্বরে,—বলি মধুকে কিছু জল খেতে দিয়েছিলে? ছেলেটা কি না খেয়ে বেরিয়ে গেল? কই শুনছ?

শিশিরকণা কড়ায় জল ঢেলে ওঠে।

যেতে চায়।

মধুসূদন একখানা হাত ধরে খপ্ করে।

ভয়ে শিশিরকণা চমকে ওঠে। বুড়ী যদি বেরিয়ে আসে!

—ছাড়ো।

—না ছাড়ব না।

—মা এসে পড়বে?

—পড়ুক।

মধুসূদনের কণ্ঠের দৃঢ়তায় অবাক হয় শিশিরকণা। হঠাৎ এক ঝলক আনন্দের ঢেউ ওঠে ওর বুকে।

—লক্ষ্মী। ছাড়ো।

মধুসূদন হাতখানা ছাড়ে না।

হলুদ মাখা হাতখানা ধরে থেকেই বলে,—ডাকতে দাও মাকে। তুমি বোস।

—কি মুস্কিল। বেরিয়ে আসবে যে!

—আসুক। চেঁচাক।

—ছিঃ!—হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে শিশিরকণা ঘরের ভেতরে যায়।

মধুসূদন তেমনি বসে থাকে।

শোনে শিশিরকণা বলছে,—ডাকছেন কেন?

মা বলছে,—মধু কোথায়?

—বারান্দায়।

—বারান্দায় কেন?—বুড়ীর কণ্ঠে যেন কিসের সন্দেহ।

গা রী রী করে ওঠে মধুসূদনের।

শিশিরকণার জবাব শোনা যায়,—তাকে ডেকে শুধোন।

বলে চলে আসে শিশিরকণা।

কিছুক্ষণ আর বুড়ীর কোন কথা শোনা যায় না।

মধুসূদন বলে,—একটু আলু ভাজা দেবে? খাই বসে বসে।

একটা বাটিতে একটু আলু ভাজা দেয় শিশিরকণা।

মধুসূদন বসে বসে খায়।

অমৃতের মত মনে হয় আজ।

—ভারী সুন্দর লাগছে। হোটেলের রান্না খেয়ে খেয়ে আর ভাল লাগে না।

শিশিরকণা সহজ হয়ে ওঠে,—কেন বললেই ত পারো ঠাকুরকে আলু ভেজে দিতে।

—বললে দেয় না। বলে, ভুলে গেছি।

শিশিরকণা তরকারী নাড়ে।

—যদিবা দেয় নরম চামড়ার মত শক্ত। এমন মুচ্মুচে নয়।

শিশিরকণার অস্বস্তি লাগে, বলে,—ঘরে যাও না।

—তার চেয়ে বলো না, কালই চলে যাও। এলেই তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত।

হাসে মধুসূদন।

এ কথার জবাব দেয় না শিশিরকণা।

এত সহজে বোঝা পড়া হতে দোব না ও এবার। ওর মনটা থেকে থেকে কেঁপে ওঠে চাপা বেদনার বেগে।

মধুসূদন হাল্কা হবার চেষ্টা করেও পারে না।

বাটিটা রেখে বলে,—কি করি বলোত' ?

—কিসের ? কি করবে।

—মায়ের কথা বলছিলুম্। —বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে আসে মধুসূদন।

শিশিরকণা একথারও উত্তর দেয় না।

উত্তর দেবার কিছু নেই।

মধুসূদন যেন গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ কাটে।

শিশিরকণার তরকারী রান্না হয়ে যায়।

কই বুড়োত' বাইরে এলো না। খোঁজও করল না কারো। বোধহয় টের পেয়েছে ছেলে বউয়ের সংগে কথা বলছে। এ সময় বাইরে গিয়ে ডাকাটা ভালো দেখায় না।

এইটুকু জ্ঞান থাকলেই ত' বাঁচা যায়। তাও যে থাকে না সবসময়।

মধুসূদন বলে,—একটু চা খাওয়াবে ?

—খাওয়াব, ঘরে যাও। লোকেই বা কি ভাবছে?

—ভাবছে বহুদিন পরে স্বামী এসেছে?

শেষ হতে পায় না কথা। শিশিরকণা থামায়,—কি যে হোচ্ছে দিন দিন!

মধুসূদন হাসতে হাসতে ওঠে।

ঘরে গিয়ে দেখে মা বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

—কি হোল এত সকাল সকাল শুয়ে?

মা কথা বলে না।

মধুসূদন আবার বলে,—ঘুমুলে নাকি মা?

—না ঘুম কি আসে?

—তবে শুয়ে কেন?

—আমাদের ত' আর বয়েসের কাল নেই বাবা যে বসে বসে গল্প কোরব। বুড়ো হয়েছি। বয়েসের কালেও আমারা এমন ছিলুম না। তোমার ঠাকুমার ডাকে ভয়ে জড়সড় হতুম। অমন পা ছড়িয়ে গল্প করতে পারতুম না বাবার জন্মেও।

মধুসূদন কি আর উত্তর দেবে?

বুড়ীর মুখ খোলে,—আজকালকার মেয়েদের না আছে ভক্তি ছেরেদ্ধা, না আছে মায়া! শাউড়ী ডাকছে ডাকুক। বরটি নিয়ে গল্প! মুখে মারো ঝাঁটা।

শিশিরকণার কানে কথা গুলো এসে বেঁধে।

এই তর্জনগুলো হজম করতে হচ্ছে মধুসূদনের জন্যে। কই এবেলা ত' মায়ের মুখের উপর একটা কথাও বলছে না। যত কথা বউয়ের বেলা। সয়ে যাও। সয়ে যাও। কই মাকে বলুক।

সত্যিই মধুসূদন একটা কথাও বলতে পারছে না।

লজ্জায় ঘৃণায় মধুসূদনের বাকরোধ হয়ে যায়।

মা এমন করে বলতে পারে এ যে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

তার বন্ধু-বান্ধবেরও ত মা আছে। কই তারা এমন করে না!

মধুসূদন গুম্ হয়ে বসে থাকে।

আস্তে আস্তে গিয়ে জামাটা পরে।

বুড়ী লক্ষ্য করে বলে,—কোথা বেরোচ্ছিস।

—বাইরে।

বুড়ীর একটু ভয় হয় ছেলে আবার রাগ করল হয়ত বা।

বলে,—এখন না বেরোলেই হোত।

—না, বাড়ীতে ভাল লাগছে না।

জামাটা পরে বেরোয় মধু।

দরজার বাইরে বেরোতেই জামায় টান পড়ে।

ফিরে দেখে শিশিরকণা।

মধুসূদন বলে,—জামা ছাড়ো।

আস্তে,—ফিস্ ফিস্ করে বলে শিশিরকণা, রাগ করে যেতে পাবে না।

মধুসূদন রান্নাঘরের দিকে সরে এসে তেমনি ফিস্ ফিস্ করেই বলে —একটু ঘুরে আসছি।

—না।—শিশিরকণা গলায় অধিকারের দাবী।

—কি কোরব তবে?

—এখানে বোস।

একখানা পিঁড়ে পেতে দেয় শিশিরকণা।

মধুসূদনকে অগত্যা বসতেই হয়।

ঘরের দোরের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পায় মধুসূদন কে একজন টুক করে সরে গেল ঘরের ভেতরে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মধুসূদনের।

ছিছি মা এমন কাজ করতে পারে।

শিশিরকণা বাসনগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখে।

মধুসূদন তাকায় বলে,—আমাকে একটু ঘুরে আসতে দাও।

—বোস না, কাপড়টা কেচে আসি। যেও না কিন্তু।

দোরের গোড়ায় এসে শিশিরকণাও দেখতে পায় বুড়ী দোরের পাশ থেকে সরে গেল।

মনে মনে হাসি পায় ওর।

ধোয়া সাড়ী ঘর থেকে নিতে গিয়ে দেখে ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে বুড়ী।

নীচে নেমে যায় শিশিরকণা।

কিছুক্ষণের ভেতর হাতে মুখে সাবান ঘসে ওপরে উঠে আসে।

দেখে রান্নাঘরে দুহাতের ভেতর মাথাটা রেখে বসে আছে মধুসূদন।

একটু মায়া হয় ওর।

একটু হিমানী মেখে চুলটা আঁচড়ে ও মধুসূদনের কাছে আসে।

মধুসূদন চোখ তোলে। শিশিরকণাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে।

হাসে শিশিরকণা,—কতদিনের ছুটি।

—পনেরো দিনের।

—মোটে। ও ত'পনেরো মুহূর্তের মত কেটে যাবে। একটা দিন ত' গেল।

—তা গেল। ভাবে মধুসূদন কিভাবে যে গেল তা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে।

ম্লান হেসে বলে,—আমার কিন্তু পনেরো দিন পনেরো বছর মনে হচ্ছে।

খোঁচাটা শিশিরকণা ধরে ফেলে, তবু হেসে শুধোয়,—কেন?

—কাটলে বাঁচি,—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মধু।

—একদিনেই হাঁপিয়ে উঠলে আর আমাকে যে রোজ এই ভোগ করতে হচ্ছে।

—সত্যি আমি হলে পালাতুম।

শিশিরকণার ইচ্ছে হোল বলে, এবার তোমার সংগে পালাব। কিন্তু বলল না। যা হবার নয় তা বলে কি লাভ!

মুচকী হেসে বলে ও—অন্য কথা,—আজ শোবে কিন্তু ও ঘরে।

—মায়ের কাছে?

—হ্যাঁ।

মধুসূদন ম্লান মুখে বসে থাকে।

—চলো আলাপ করবে ফুলমণির ভগ্নীপোতের সংগে। ধীরেনবাবু বড় ভালবাসে তোমায়।

—না ওর সঙ্গে বক্ বক্ করতে ভাল লাগবে না।

—ও কিন্তু আমাদের যথেষ্ট দেখাশুনো করে।

—লোকটি ভাল। কাল দেখা কোরব।

শিশিরকণা আবার অন্য কথা পাড়ে,—একটা জিনিষ দেবে?

—কি?

—তোমার একখানা ফটো দেবে?

মধুসূদন হেসে ফেলে,—কি হবে? ফটো তুলতে আমার ভাল লাগে না। যদি মরে যাই, ভাল ফটো তুলে রেখো।

শিশিরকণা রেগে বলে,—অমন যা তা বোল না বলছি! বলো দেবে না।

—আচ্ছা দোব।

কবে?

—এবার জব্বলপুর গিয়ে পাঠাব।

—কেন এখান থেকেই তুলে দিয়ে যাও না?

মধুসূদন শেষ পর্যন্ত রাজী হয়,—দেখি—কাল যদি তুলতে পারি

শিশিরকণা বলে,—কই আমার ফটো ত চাইলে না?

—তোমার? কি হবে?

—বারে বা! আমায় একটু দেখতেও ইচ্ছে হয় না।

—হয়।

—তবে?

—তখন তোমায় ভাবি।

—দূর্! ভাবলে কি মন ওঠে।

—আমার ত' খুব ভাল লাগে।

—আচ্ছা কলকাতায় চলে আসতে পারো না?

—চেষ্টা করলে পারি।

—তবে চেষ্টা করো না কেন?

মধুসূদন জবাব দেয় না।

—কই বলো?

—এমনি।

—কি একটা কথা লুকোচ্ছো আমার কাছে।

মধুসূদন জবাব দেয় না।

শিশিরকণা আবার বলে,—চেষ্টা করে চলে এসো না এখানে।

—ভাল লাগে না।

—কিন্তু আমি যে আর পারি না।

—তা আমি কি করবো।

—তুমিই ত' করবে। আর কে করতে আসবে শুনি।

মধুসূদনের স্বর গম্ভীর,—আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—তা বললে চলবে না। এখানে চলে এসো বদলী হয়ে।

—না। সে হয় না।

—কেন শুনি? চিরটা জীবন কি আমার একা থাকতে হবে নাকি!

—দরকার হলে তাই-ই হবে।

—তবে বিয়ে করবার কি দরকার ছিল?

—সে কথা আর আজ তুলে লাভ নেই।

—না, জবাব দিতে হবে।

—বিরক্ত কোর না আমায়।

শিশিরকণার চোখে মেঘ নামে,—আমারই কি সব দায়?

—আমি ত' বলিনি সে কথা।

—বাপের বাড়ী চলে যাব তাহলে। মত দিয়ে যাও।

—যেতে পারো। কঠিন হয়ে উঠেছে মধুসূদন।

শিশিরকণা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

ও জানে বাপের বাড়ীতে ভাইয়ের কাছে যাওয়া চলবে না। বাপ নেই। বেশীদিন থাকলে ভাই শেষ পর্যন্ত বিরক্তও হয়।

মধুসূদন নিশ্চয়ই এ কথা জেনেই তাকে এমন করে বিঁধতে পারছে। মধুসূদন জানে তার কোথাও স্থান নেই। তাই এত অবহেলা।

শিশিরকণার মুখখানা থম্‌থম্‌ করে।

মধুসূদনের মনও বিরক্তিতে ভরে ওঠে। আসবার পর থেকেই। ওর যেন আর একমুহূর্তও ভাল লাগছে না এখানে।

ইচ্ছে হয় আজই জব্বলপুরে চলে যায়।

ভেতর থেকে আওয়াজ আসে,—কি গো বউমা। মধুকে খেতে দাও।

ওরা কেউ জবাব দেয় না।

—রাত যে অনেক হোল। গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ ত' অনেক হোল। এবার খাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়ো। কেউ জবাব দেয় না।

ফুলমণি এসে পড়ে।

—কই তোমাদের খাওয়া হয়নি বৌদি?

শিশিরকণা একটু ঘোমটা টানে,—এইবার হবে ভাই।

থালায় ভাত বাড়ে শিশিরকণা।

মধুসূদন খুব সামান্যই খায়।

ইতিমধ্যে শিশিরকণা গিয়ে মধুসূদনের বিছানাটা করে দিয়ে আসে বুড়ীর কাছে।

ফুলমণি ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—মাসীমাকে দাওনা বাইরে।

—না ভাই থাক।—গম্ভীর হয়ে বলে শিশিরকণা।

ফুলমণি আবার শুধোয়,—তুমি কোথা শোবে?

—এই রান্নাঘরে।

ফুলমণি বোঝে বৌদির মন খারাপ।

আর কথা বাড়ায় না। আস্তে আস্তে চলে যায় শুতে। তারও ত' রান্নাঘরেই শুতে হয়। ধীরেনবাবু আর সমরেন শোয় ঘরে। ধীরেনবাবু বলে অনেক করে ফুলমণিকে,—তুই ও ত' ঘরের একপাশে শুতে পারিস।

ফুলমণি শোয় না।

কে জানে কে কি বলে বসবে। তাছাড়া ধীরেনবাবু নেশাভাঙ করে। নেশার ঝোঁকে মানুষের জ্ঞানগম্যি কিছু থাকে না।

সমরেন রয়েছে। মাঝে মাঝে সমরেনের চাওনিটাও ভাল লাগে না ফুলমণির। ফুলমণি মেয়ে মানুষ। পুরুষের চোখের চাউনীর ভাষা পড়তে পারে ওরা।

চোখের চাউনী দেখেই বলতে পারে যে কোন মন নিয়ে তাকায়।

রান্নাঘরেই গিয়ে শোয় ফুলমণি।

দেবযানীর ঘরও নিস্তব্ধ।

বাসুদেববাবু কি একখানা বই পড়ছে। মালতী ঘুমোচ্ছে।

লোকটা অনেক রাত অবধি বই পড়ে। কখন যে ঘুমোয় কে জানে।

মধুসূদন গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ে।

শিশিরকণাও শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ঘুম ওদের একজনেরও হয় না।

মধুসূদন অনেক কঠোর কথা বলেছে শিশিরকণাকে। মনটা ওর ভাল লাগে না। না বললেই হোত। কিন্তু কাকেই বা বলবে ?

মন যখন খারাপ হয়, তখন একজনকে কিছু বলতে পারলে ,কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়। মনের আক্ষেপ রাগের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভাষায়। শিশিরকণাকে বলতে হয়েছে অনেকগুলো কঠিন কথা। ও জানে শিশিরকণার প্রাণে কথাগুলো বিঁধবে। তবু তখন সে না বলে পারেনি, নিজেকে অতখানি সংযত করার অভ্যাস তার নেই। অনুতাপ পরে আসবেই।

মনটা ভারী খারাপ লাগে শিশিরকণার জন্যে। একা একা ঘুমোচ্ছে রান্নাঘরে। স্বামী ওর থেকেও নেই।

বড় মায়া লাগে! একবার ভাবে কালই নিয়ে যায় শিশিরকণাকে এখান থেকে।

মাকে দেখবে কে ?

মাকে নিয়ে যাওয়া। সে অসম্ভব। মায়ের অনর্গল কথার তোড়ে তার ধৈর্য নষ্ট হয়ে যায়। সহ্য করতে পারবে না ও। হয়ত কখন কি করে বসবে।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে মধুসূদন।

রান্নাঘরে শুয়ে শিশিরকণার মনের জমাট আঘাতগুলো পাষাণের মত ভারী লাগে।

কেউ নেই তার সংসারে। স্বামীও আজ তাড়িয়ে দিতে চায়। বাবার কথা আজ মনে হয় বড় বেশী। বাবার বড় আদরের মেয়ে ছিল শিশির-কণা। সে জন্মাবার পর নাকি বাবার চাকরীর উন্নতি হয়েছিলো। বাবার সামনে কেউ তাকে একটু বকতে পারত না। মা দাদা কেউ নয়।

যখন যা চেয়েছে বাবা তাই দিয়েছে।

একটু কাঁদলে কি করে থামাবে ভেবে পেতো না বাবা।

বিয়ে ত বাবা খারাপ দেয় নি। ভাল ছেলে। রেলে কাজ করে। সবই সুখের। তবু বরাতে সুখ না থাকলে সুখত' কেউ গড়ে দিতে পারে না।

কান দুটো জ্বালা করে শিশিরকণার। মাথার তালু দিয়ে আগুন বেরিয়ে গেল।

চুপ করে শুয়ে থাকতেও কষ্ট হয়।

তবু শুয়ে থাকতে হবে। কাল ভোরে উঠে কাজ করতে হবে। গালাগালি শুনতে হবে। চুপ করে সইতে হবে।

ওর হাত পা গুলো ঝিম্ ঝিম্ করে।

চুপ করে পড়ে থাকে সতরঞ্চিটার উপর।

পায়ের উপর কার হাতের স্পর্শ।

—কে ?

—চুপ। আমি।

মধুসূদন এসেছে। চোরের মত। লুকিয়ে।

মাথার কাছে এসে হাতটা ধরে মধুসূদন,—একটা কথা না বলে ঘুমুতে পারছি না।

শিশিরকণা কাঠ হয়ে থাকে।

—আমাকে ক্ষমা কোর।

মনে মনে ভাবে শিশিরকণা কিনের ক্ষমা।

—তোমার কষ্ট আমি বুঝি। কিছু ত' করবার নেই।

ছাই বোঝে। আবার সেধে আদর দেখাতে এসেছে।

—সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনে। অনেক অন্যায় কথা বলেছি।

শিশিরকণা চোখদুটো ভিজে আসে।

—বলো, কিছু মনে করোনি।

বালিসের উপর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

—কই বলো।

মাথায় হাত বুলোয় মধুসূদন।

ওর হাতখানা গালের ওপর টেনে নেয় শিশিরকণা।

হাতখানা ভিজে ওঠে চোখের জলে।

—কেঁদোনা।

কিন্তু কান্না ত' রোধ করতে পারে না ও।

—আর কেঁদোনা। তোমার কথা দিচ্ছি।

—কি ?

—এবার একটা ব্যবস্থা কোরবই।

শিশিরকণার মুখের ওপর মধুসূদনের ভিজে হাত।

—এবার একটা কিছুই করতেই হবে। আর সওয়া যায় না। তোমাকে আর কষ্ট দেয়া আমার উচিত নয়।

শিশিরকণা কিই বা বলবে।

—আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি। দেখো তুমি।

আকাশের দিকে তাকায় মধুসূদন।

কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে কালো এক ফালি আকাশে।

ওধারে কে একজন ঘর থেকে বেরোল।

আবার ঢুকল ঘরে।

বোধহয় বাসুদেববাবু।

—আর কটা দিন সইতে পারবে না?

ঘাড় নেড়ে জানায় শিশিরকণা,—পারবো।

অনেক রাত হয়েছে।

গভীর নিস্তব্ধতায় দুজনের মনে কি কতকগুলো কথা তোলপাড় করে।

শিশিরকণা বলে,—একটা অনুমতি দোব?

—কি?

—তুমি না হয় জব্বলপুরে আর একটা বিয়ে করো। আমি এখানে মাকে নিয়ে থাকি।

মধুসূদনের বুকটা টন্ টন্ করে ওঠে।

এত বড় ঠাট্টাও আজ শিশিরকণা তাকে করতে পারলো।

—কই কিছু বলছ না যে!

মধুসূদন চুপ করে থাকে।

—কথা দাও।

মধুসূদন কথা বলে না হাতখানা টেনে নেয়।

—রাগ করলে?

—না।

—তবে?

—ভাবছি। ঠিকই বলেছ। আরও বলো। আমাকে শুনতেদোও আরও

শিশিরকণা বোঝে মধুসূদনের কোথায় লেগেছে কথাটা।

—ওখানে কি কোন বাঙালী মেয়ে নেই ?

—অনেক আছে।

—একটিকে ঠিক করে পছন্দ করো। আমায় ফটো পাঠিও তার।

মধুসূদনকে ধীর ভাবে কথা গুলো সইতে হয়। রাগ আর সে করবে না।

—ভাল দেখতে। বেশ ফর্সা। আমার মত পেত্নী নয়।

হাসে শিশিরকণা চোখে জল নিয়ে।

—তারপর ? শুধোয় মধুসূদন।

—তারপর আর কি, বিয়ে করো।

—তুমি সইতে পারবে ?

—খুব। করেই দেখোনা।

মধুসূদন আর উত্তর দেয় না।

ধীরে ধীরে ওঠে।

শিশিরকণাও আর আটকায় না। মনটা অনেক শান্ত হয়ে এসেছে ওর।

মধুসূদন ঘরে চলে যায়।

শিশিরকণা ঘুমোয়। গভীর ঘুম।

কখন যে ভোর হয়ে গেছে। রোদ উঠে গেছে টের পায়নি।

ঘুম ভেঙেই কাল রাতের কথা মনে পড়ে।

ভাবতে বেশ আরাম লাগে। খুব আনন্দ লাগে আজ।

রোদ উঠে গেছে। ইস্! অনেক বেলা হয়েছে।

বিছানাটা ভাঁজ করে নিয়ে ঘরে ঢোকে। মা তখনও শুয়ে আছে। ও কই ? সকালে বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছে।

—মা উঠুন। বেলা হয়ে গেছে।

বুড়ী একটু এপাশ ওপাশ করে। দুগ্‌গা দুগ্‌গা!

ওঠে বুড়ী।

—আপনার ছেলে কি বেরিয়েচে?

—কই? বোধহয় বেরিয়েচে।

শিশিরকণার কেমন কেমন ঠেকে। বুকটা ছাঁত করে ওঠে। স্যুটকেস্ ত' ঘরে নেই। কম্বলখানাও নেই।

—কখন বেরিয়ে গেছে জানেন না।

—না ত'।

—কই তার বাক্স বেছানা ত' দেখ্‌চি না।

—সে কিঁ গো! বলো কি বউমা!

বুড়ী উঠে পড়ে,—তাই ত' গো! ওর বাক্স যে নেই!

আঃ। চেঁচাবেন না।—শিশিরকণার মুখ শুকিয়ে ওঠে এক অজ্ঞাত আতংকে। কাল রাতের কথাগুলো মনে পড়ে আবার।

জামা নেই। স্যুটকেস নেই। বিছানা নেই।

সে নিশ্চয়ই চলে গেছে।

তাই যাবার আগে শেষ কথা বলে গেল কাল রাত্রে।

শিশিরকণা বসে পড়ে।

বুড়ী আতংকে স্তব্ধ হতবাক্ হয়ে পড়ে।

গলায় আওয়াজ বেরোয় না তেমন,—কণ্ঠে অনুতাপের হতাশা প্রকাশ পায়,—বউমা, ও কি আমার ওপর রাগ করে চলে গেল।

শিশিরকণা শ্বাশুড়ীর দিকে তাকায়,—না, তা' কেন। বোধহয় জরুরী কাজ ছিল।

—না, তুমি জানো না, ও নিশ্চয়ই রাগ করেছে।

—তা হবে।

—তোমাকে কিছু বলেছে ?

—না, তেমন কিছু বলেনি।

বুড়ী অনুনয় করে যেন,—কি বলেচে ?

শিশিরকণা ইতস্তত: করে,—কি আর বলবে। একটু কথা কাটা কাটি হয়েছে।

—আমাকে নিয়ে ?

—না, আপনাকে নিয়ে কেন হবে।

বুড়ী তবু বলে,—তুমি জানো না, ও নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেচে। আমি এখন কি করি বলো ত'।

বুড়ীর চোখের হতাশায় শিশিরকণার একটু মায়া হয়,—বলে,—কি আর করবেন। আবার আসবে।

বুড়ী বিছানার তলা থেকে টাকা বার করে,—এই নাও। টাকা কটা দিয়ে গেছে।

শিশিরকণা বলে,—থাক্ না, আপনার কাছে।

—না, তোমার কাছে রাখো।

জোর করে শিশিরকণার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বুড়ী আবার শুয়ে পড়ে।

বলে,— শরীরটা ভাল নেই মা।

—কি খাবেন আজ ?—শিশিরকণা অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করে।

—আজ আর কিছুই খাব না ভাবচি।

—একটু সাবু খান না হয়।

বুড়ী চুপ করে শুয়ে নিজের মনে বিড়-বিড় করে।

শিশিরকণা বাসন নিয়ে নীচে নামে।

আবার দৈনন্দিন কাজ।

কাটলো কয়েক দিন।

ভাড়াটেদের ভেতর সবাই জেনেছে ওপরের বউয়ের বর রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, খোঁজ নেই কোন।

কথাটা রটিয়েছে ফুলমণি।

শিশিরকণা আজই বলেছিলো, বোধ হয় রাগ করে গেছে। কে জানে কি হবে ভাই। ভয় হচ্ছে বড়।

ফুলমণি যথারীতি বলেছিলো,—ভয় কি? আবার চিঠি দোব আসবে।

—কাউকে বোল না কিন্তু,—

নিষেধ করেছিলো শিশিরকণা।

ফুলমণি বললে,—বলতে আবার যাব কাকে, কার সঙ্গেই বা মিশি।

পরদিনই প্রমিলা দেবীর কুটনো কোটবার সময় গিয়ে হাজির ফুলমণি।

এ কথা সেকথার পর ফিস্ ফিস্ করে বলে, বলবেন না কাউকে। ওপরের বৌয়ের বর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। রাগ করে। যেমন দজ্জাল মা তেমনি দজ্জাল বউ! ভদ্দর লোকেরই বা কি দোষ।

—বটেই ত'—সায় দিলেন প্রমীলা দেবী,—পুরুষ মানুষ এ্যাদ্দিন পর এলো। দুটো মিষ্টি কথা নেই, খুসী নেই। ক্যাট্ ক্যাট্ করে চলেছে মাগী দুটো।

—যা বলেচেন,—এক গাল হাসে ফুলমণি। কথাটা বলতে পেরে ওর পেট হালকা বোধ হচ্ছে। এতক্ষণ যেন দম আটকে আসছিলো।

প্রমীলা দেবী ঘচাঘচ লাউ কুটতে কুটতে বলেন,—যেমন অংখারী তার তেমনি হয়েছে। মর্ এখন।

ফুলমণিও বলে,—কি দেমাক, আর কি মুখ। আমাকেই ত' একদিন যা নয় তাই বলে অপমান করলে। চন্দর সূয্য কি নেই। দেখুন হাতে হাতে ফল।

—তাই ত' বলি বাছা! ভগবানের রাজত্বি। ওই যে আরেক দেমাকী আছেন। এম, এ পাশ। ধিংগি নাচুন।

ফুলমণির হাসির বহর দেখে কে!

খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলে, ওটা যেন একটা সং।

ছেলেখেকো সং।

কত রকম রং মাখে দেখেচেন? মুখে গালে।

ঝুমুর এসে পড়ে।

শেষ কথাটা শুনে বলে, মাখুক না। তা' তোমার কি শুনি।

শুনলেন মাসীমা।—ফুলমণি রাগে।

ঝুমুর দুচক্ষে দেখতে পারে না এই মোটকা মেয়েটাকে।

দেখলে গা জ্বলে। বড় পাকা পাকা ভাব। সেকেলে বুড়ীদের মত অসভ্য কোথাকার!

ফুলমণিও ওদের কাছে বেশী ঘেঁসে না। মাসীমা বৌদি এদের সংগে ওর ভাব বেশী।

প্রমীলা বলে ঝুমুরকে, তুই আবার কথা বলতে এলি কেন?

ঝুমুর মুখ ঝামটা না দিয়ে পারে না,—তোমাদের দিন রাত্তির পরচর্চা!

—পর আবার কোথায় দেখলে? বলে ফুলমণি, এত সব আপনার আপনার ভেতর কথা হচ্ছে। তোমরাই সকলকে পর পর ভাবো।

ঝুমুর আর উত্তর দেয় না ফুলমণির কথার। বলে, চারানা পয়সা লাগবে মা। খাতা কিনব।

প্রমীলা বললে, এই ত সেদিন খাতা পেনসিল কিনলি। রোজ রোজ এত খাতা।

বারে বা! সে ত' দেড় মাস আগের কথা।

আঁচল থেকে পয়সা বার করে দেন প্রমীলা দেবী।

ফুলমণি উঠে যায়।

সন্ধ্যায় মন্মথবাবু ফেরে একটু অসুস্থ হয়ে, বাড়ীতে ঝুমুর ছিল।

ঝুমুর আর রবীন তখনও ফেরেনি। প্রমীলা দেবীকে কিছু বলতে সাহস পায় না মন্মথবাবু। ঝুমুরকে বলেন,—মাথাটা বড় ঘুরছে মা! গামছাটা দে ত'। হাত পা ধুয়ে এসে শোব।

—চা খাবে না?

—না।

ঝুমুর গামছাখানা এগিয়ে দেয়।

কলতলায় গিয়ে কিছুক্ষণ পরই আছাড় খেয়ে ঝুমুরকে ডাকেন মন্মথবাবু।

ঝুমুর তাড়াতাড়ি কলতলায় গিয়ে দেখে মন্মথবাবু পড়ে আছেন, উঠতে পাচ্ছেন না।

মাকে চীৎকার করে ডেকে ঝুমুর মন্মথবাবুকে ধরে তোলে, ভেতরে চলো।

—চলতে পাচ্ছি না মা। পা কাঁপছে। ভাল করে কথাও বলতে পারেন না মন্মথবাবু।

প্রমীলাদেবীও কলতলায় আসেন।

দুজনে ধরাবরি করে ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় মন্মথবাবুকে।

ঝুমুর বলে, ওপর থেকে একটু দুধ চেয়ে আনব মা, বাবাকে একটু গরম করে দোব?

—না, না, কার ঠেঙে আবার চাইবি। এককাপ চা বরং করে দে গুঁড়ো দুধ দিয়ে।

বলে প্রমীলাদেবী বাক্স গোছাচ্ছিলেন যেমনি, তেমনি গোছাতে থাকেন।

ঝুমুর রান্নাঘরে যায় চা করতে।

মন্মথবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, একটু জল দেবে?

প্রমীলাদেবী শুনেও শোনে না।

মন্মথবাবু আর কিছু বলতে পারেন না।

উনুনে আগুন দিয়ে চা করতে করতে ঘণ্টা খানেক কেটে যায় প্রায়।

ঝুমুর চা করে এসে দেখে প্রমীলাদেবী বারান্দায় বসে কুটনো কুটছেন।

—বাবা কি ঘুমোচ্ছে?

—দেখগে যা ভেতরে। কণ্ঠে বিরক্তি নিয়ে বলেন প্রমীলাদেবী।

ভেতরে গিয়ে ঝুমুর চা রেখে মন্মথবাবুকে ডাকে, বাবা, চা খাবে না? বাবা।

মন্মথ বাবুর সাড়া নেই।

—ও মা, বাবা যে কথা বলে না।

প্রমীলা দেবী উঠে আসেন।

বাবা কথা বলে না। ঝুমুর ভয়ে কাঁদো-কাঁদো।

প্রমীলাদেবীরও মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে।

এতক্ষণ তিনি ভেবেছিলেন টাকা যোগাড় করতে না পেরে মন্মথবাবু চালাকী করে শরীরটা খারাপ দেখাচ্ছেন। বাড়াবাড়িটা তাঁর বিরক্তির উদ্রেক করেছিলো। একটা আছাড় খেলে অমন একটু দুর্বল মনে হয়, তার জন্য অত কি!

তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে টাকা মন্মথবাবু আজ নিশ্চয়ই আনেন নি। তাই মেজাজটা আরো চড়েছিলো।

কিন্তু হঠাৎ যে এমন ধারা হবে কে জানে।

প্রমীলাদেবীর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

তিনি ফুঁপিয়ে ওঠেন ওরে একটা ডাক্তার ডাক। আমার কপালে কি হোল গো!

ঝুমুর চোখ মুছতে মুছতে ওপরে যায়।

বাসুদেব ঘরে ছিল আর ঘরে ছিল সমরেন।

ওরা সবাই বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীচের মন্মথবাবুর ঘরে কান্নার আওয়াজ শুনে।

ঝুমুর উঠতেই শুধোয় সমরেন, কি হোল?

ঝুমুর চোখ মুছে বলে, বাবা কথা বলছে না। জ্ঞান নেই!

সমরেন ঝুমুরের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ বড় একটা পায়নি। ঝুমুর নুপুর ওরা ফুলমণি সমরেনদের অশিক্ষিত বলেই মনে কোরত।

সমরেন আরও এগোয়, ডাক্তার এনেছেন?

ঝুমুর অনুনযের সুরে বলে, ডেকে দিন না।

বাসুদেব ঘরে চলে যায়।

সমরেন লাফিয়ে ঘরে গিয়ে জামাটা পরতে পরতে বেরিয়ে যায়।

শিশিরকণা, ফুলমণি, মালতী, সবাই নীচে নামে ঝুমুরের সঙ্গে।

দেবযানীর ঘর এখনও বন্ধ। অফিস থেকে ফেরেনি এখনও।

ধীরেন বাবুও ফেরেনি।

সবাই নীচে নেমে ঝুমুরদের ঘরে জোটে।

প্রমীলাদেবী শিশিরকণাকে একবার মালতীকে একবার জড়িয়ে ধরেন,—আমার কি হবে গো!

মালতী সান্ত্বনা দেয়,—চুপ করুন। অত অস্থির হবেন না।

শিশিরকণার চোখ ছলছল করে, কথা বলতে পারে না। স্বামী মরা যে কি কষ্টের নিজেকে দিয়ে কল্পনা করে ও শিউরে ওঠে। মধুসূদনের চিঠি আজও পায়নি।

কার কপালে কি আছে কে জানে বাপু!

ঝুমুর চোখ মোছে।

ফুলমণি বলে ঝুমুরকে,—কেঁদোনা ভাই। চোকে মুকে একটু জলের ঝাপটা দাও না।

ঝুমুর অসহায় চোখে তাকায় ফুলমণির দিকে।

এই ফুলমণিকে আজ সকলেই যে গালাগাল করে তাড়িয়েছি।

চোখে মুখে মাথায় জল দেয় ঝুমুর। ফুলমণি সাহায্য করে।

জল দিতে দিতে একটা নিশ্বাস ফেলেন মন্মথবাবু।

ডাক্তার নিয়ে আসে ইতিমধ্যে সমরেন।

—এই ডাক্তারবাবু! বলে ঝুমুরের দিকে তাকায় একটুখানি উপকৃতার হাসির আশায়।

ঝুমুর তাকায় না।

ফুলমণি ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়।

ডাক্তারবাবু দেখেন ভাল করে।

ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে মন্মথবাবুর।

—খুব দুর্বল। লো প্রেসার থেকেই এমন হয়েছে। বেশী নড়তে দেবেন না। ভাল খাওয়া দাওয়া করতে হবে। ধরুন সবই খাবে, তবু প্রোটিন মানে মাছ, মাংস, ডিম, ছানা এগুলো বেশী খাবে।

প্রমীলাদেবী চোখ মোছেন।

মন্মথবাবু তাহলে মরেননি, অজ্ঞান হয়ে ছিলেন।

ঝুমুর ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা হাতে নেয়।

—যদি আরও দুর্বল বোঝেন। আমায় রাত্রে একবার খবর দেবেন।

উঠে পড়ে ডাক্তারবাবু।

সমরেন এগোয় ডাক্তারের সঙ্গে।

ঝুমুর এগিয়ে সমরেনকে শুধোয়,—ভিজিট কত?

—অন্য লোকের ঠেঙে আটটাকা নেয়। তা' আমি চার টাকা দিলেই হবে।

ঝুমুর মাকে এসে বলে, চার টাকা।

—চার টাকা! চার পয়সা ঘরে নেই। আজই ত' মন্মথবাবুর টাকা আনবার কথা ছিল। টাকা আনতে না পেরে উলটে খরচা।

প্রমীলাদেবী শিশিরকণা মালতীদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলে,—একটা পয়সাও ত' ঘরে নেই মা!

মালতী তৎক্ষণাৎ বলে,—ঝুমুর ওপরে এসো, আমি টাকা দিচ্ছি।

সমরেন ওধার থেকে বলে,—ঠিক আছে।

বলে পকেট থেকে টাকা বার করে ডাক্তারের হাতে দেয়।

ডাক্তার কথাগুলো সবই শোনে।

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ঝুমুরের মুখখানা। ছলছল চোখদুটি নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে।

—ওষুধটাও আমি নিয়ে আসছি। দিন কাগজখানা,—চায় সমরেন ঝুমুরের কাছে।

ফুলমণি রাগে ফোলে।

ঝুমুর বলে,—থাক্ পরে আনাব।

—একেবারে নিয়ে এলেই হোত!

ঝুমুরের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। কথার কোন উত্তর দেয় না।

সমরেন আরও কি বলতে যাচ্ছিল।

এর ভিতর রবীন এসে পড়ে।

—কি হয়েছে ?

ঝুমুর দাদাকে দেখে চোখের জল রাখতে পারে না। সব বলে।

রবীন সব শোনে।

সমরেনকে বলে,—আপনি যা উপকার করলেন।

—না, না, এ আর উপকার কি—,—সমরেন বলে।

ফুলমণি সমরেনকে ডাকে,—চলে এসো।

রবীনের সামনে ফুলমণি থাকতে চায় না, সমরেনকেও রেখে যেতে চায় না।

সমরেন ফুলমণিকে ধমকে ওঠে,—দাঁড়া না, অত ইয়ে করলে চলে !

ফুলমণি অগত্যা চলে যায়।

রবীন সমরেনের দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনার কাজ থাকে ত' যান।

সমরেন ঝুমুরের দিকে দুবার তাকিয়ে চলে যায়।

রবীন ঝুমুরকে বলে,—দে প্রেসক্রিপশানটা দে।

ঝুমুর বার করে দেয়।

প্রমীলাদেবী বলেন,—টাকা কোথা পাবি বাবা !

—সে আমি দেখব'খন। বাবাকে বসে বাতাস করো। আমি আসছি।

ট্রাউজার সার্ট পরে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যায় রবীন। বেরোবার আগে একবার দেবযানীর ঘরের দিকে চোখ তুলে তাকায়। এখনও আসেনি।

বেরোবার মুখে সদরে নুপুরের সঙ্গে দেখা।

নুপুর হাত ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ঢুকছে।

রবীনকে দেখে থামে।

রবীন শুধোয়,—তোর কাছে টাকা আছে নুপুর ?

—টাকা ! না' ত ?

—আচ্ছা, থাক।

বলে একরাশ চিন্তা চোখে মুখে নিয়ে বেরোয় রবীন।

ওখান থেকে সোজা ক্লাবে যায় রবীন। ক্লাবে বসে ছিলো সবাই। ব্রীজ খেলা হচ্ছিল। বিমলও বসে ছিল আজ।

রবীন ব্যাগটা রেখে বসে পড়ে।

একদান খেলা শেষ হতেই রবীন ডাকে ভোম্বলকে,—একটু শোন না ভাই !

—কি, বলনা ?

ভোম্বল তাস সাপ্‌ল্ করতে থাকে। ওঠে না।

রবীন কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকে। তারপর কি একটু ভেবে সকলের সামনেই বলে,—তোদের কারো কাছে বেশী টাকা আছে। গোটা কুড়ি টাকা দিতে পারবি ? মাইনে পেয়ে দোব।

টাকা ! এর ওর মুখের দিকে তাকায়। পকেট খুঁজে দু'চার আনা দু'চার টাকা হাতড়ে সবাই ঠোঁট ওলট্টায়।

দু' একজনের কাছে ছিল। তারা দিতে ইতস্ততঃ করে।

ওরা ত' গরীব ! যদি না দিতে পারে।

—কি ব্যাপার। হঠাৎ টাকা ?

রবীন ইচ্ছে না থাকলেও বলে,—বাবা বিকেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে

গিয়েছিলেন। তার ডাক্তার ওষুধ এই সব—মানে মাস শেষ হয়ে এলো ত' ?

বিমল এতক্ষণ বসেছিলো।

রবীনকে ডাকে,—আয়।

—কোথায় ?

—আয় না আমার সঙ্গে।

রবীন বিমলের সঙ্গে বেরোয়। ওরা আবার খেলতে থাকে।

বিমল রবীনকে বাইরে এসে বলে,—আমার বাড়ী চল! কত টাকা চাই তোর ?

—গোটা কুড়ি।

—কুড়ি টাকায় কি করে হবে? ডাক্তারের ভিজিট, ওষুধ, পথ্যি!

—এই টেনেটুনে।

—কি অসুখ তোর বাবার ?

—ডাক্তার ত' বললে ব্লাড প্রেসার।

বিমল চলতে চলতে ওর বাড়ীর সামনে এসে পড়ে। ভেতরে ঢুকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

—নে, পঞ্চাশটা টাকা দিলুম। এ মাসটা চালিয়ে নে।

রবীন ইতস্ততঃ করে,—এত টাকা পরের মাসে যদি শোধ করতে না পারি! মাইনেই ত পাই পঞ্চাশ।

—না পারিস পরে দিবি।

বিমল ক্লাবের দিকে চলে যায়।

রবীন টাকা নিয়ে ডাক্তারখানার দিকে যায়।

পঞ্চাশ টাকায় দিন চারেকের বেশী যায় না। আবার টাকার

দরকার! প্রমীলাদেবী সকালেই বলেন—রবীনকে,—টাকা ত' ফুরিয়ে গেল বাবা!

রবীন কথা বলে না। বলবার কি আছে। আর কোথায় ও ধার পাবে।

প্রমীলাদেবী বলেন অগত্যা,—আমার বালা দু' গাছা না হয় বাঁধা দিয়ে—।

নুপুর বলে,—থাক মা, দেখি আমি বন্ধুদের কাছে কিছু ধার পাই কিনা?

শোধ যে কি করে হবে, সে কথা সকলের মনেই আসে। তবু মন থেকে এখনও প্রশ্নকে দূরে রাখা ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

বড় জোর মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মনে হয়, মন্মথবাবুই সেরে উঠে শোধ দেবেন।

মন্মথবাবু সেরে উঠবেন, তারপর শোধ করবেন টাকা!—এ যে কত বড অসম্ভব কল্পনা এটা জেনেও মনকে বোঝাতে হয়। হতাশ অবস্থাকে অস্বীকার করবার কি আশ্চর্য ব্যর্থ চেষ্টা।

তবু নুপুরকে চেষ্টা করতেই হবে টাকার জন্যে।

ভবিষ্যতের কথা এখন ছাই চাপা থাক।

কিন্তু বলেই ভাবে নুপুর যার ভরসায় কথাটা সে বলল সে দেবে ত'।

নিশ্চয়ই দেবে।

দিনের পর দিন সুবীরের সঙ্গে মিশছে সে। আজকাল প্রায় সন্ধ্যায়ই তাকে যেতে হয় সুবীরের অনুরোধে কোন নির্জন মাঠে অথবা সিনেমায় অথবা সুবীরের নিরালা বাইরের ঘরে।

বসে সুবীরের কাব্য শুনতে হয়।

দেখতে হয় সুবীরের আশ্চর্য সুন্দর মুখখানা আর চোখদুটো অনেকক্ষণ ধরে।

বলতে হয় কত মিষ্টি কথা সুবীরের মান ভাঙাতে কখনো সখনো। কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ সুবীর!

হয়ত খেয়ালে বলে বসে,—তোমার এলো চুলে আমার মুখখানা ঢেকে দাও।

নুপুর পারে না।

—না দিতেই হবে।

নুপুর মৃদু হেসে বলে হয়ত,—আজ থাক না!

—আজই।

নুপুরের ভয় হয়। চুলে ত' কতদিন সাবান দেয়া হয়নি। তার উপর নারকেল তেলের সুবাস কিছু নেই। সুবীরের কি ভাল লাগবে যদি সুবীরের কল্পনার সঙ্গে ঠিক তেমন করে না মেলে!

পরে না হয় সাবান মেখে সুবাসিত তেল মেখে একদিন সুবীরের মুখ ঢেকে দেবে তার এলো চুলে।

সুবীরের তৃপ্তি হবে। ওর কল্পনা সার্থক করতে পারবে।

সুবীর ত' জানে না ওর প্রেমের কত কল্পনাকে মনের তলায় পিষে দিতে হয় অফুরন্ত অর্থবিলাসের অভাবে। সুবীরের প্রেমের বিলাসকে সে কি করে তৃপ্ত করবে?

নুপুর কিছুতেই চুল খোলে না।

শেষ পর্যন্ত সুবীর টেনে ওর চুল খুলে দেয়।

মুখ লাল হয়ে ওঠে নুপুরের ভয়ে লজ্জায়।

সুবীরের যেন এ সব বহু কালের অভ্যেস।

চুলের গোছা চোখে মুখে ছড়িয়ে দেয়।

শুধু কি এই। আরও কত আবদার সুবীরের।

হাত ধরে অনেক্ষণ বসে থাকা। গান শোনা, গান গাওয়া।

কত কথা। কত গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা!

তুমি ছাড়া জীবনে আর কেই বা আছে।

তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না। আমার সবটুকু সত্ত্বাই তুমি।

তোমার বিয়ে যদি আর কারো সঙ্গে হয়?

নুপুর কপট গাম্ভীর্য নিয়ে হয়ত বা জবাব দেয়, হয় যদি হবে।

—তখন আমি কি করবো জানো?

—কি?

—এখনকার দুটো সন্ধ্যার ডায়েরী সোনার ফ্রেমে মুড়িয়ে তোমার উপহার দেবো।

—আমার বর দেখে হাসবে। বলে নুপুর।

—আর তুমি?—শুধোয় হয়ত সুবীর।

—আমি? আমি কি করবো জানি না।

—বলো তুমি কি করবে?

—কি করে বোলব। অত ভাবিনি।

সুবীর রাগ করে।—তুমি একটু ভাবো না আমার জন্যে?

—না যত ভাবনা তোমার।

সুবীর হাসে। হাসলে ওর পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁতগুলো কি সুন্দর দেখায়।

চিন্তার মধুতে ডুবে থাকে নুপুর।

তাই ভাবে এত যে আপনার তার কাছে অন্তত দুশ' টাকা ধার চাওয়া কিছুই নয়। সে দেবে না ত' কেই বা দেবে। ভবিষ্যতের ত' সবই তাকেই দিতে হবে।

যাক ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ দুশ' টাকা তার চাই। দুশ' টাকা। সুবীরের কাছে কিছুই নয়। এক সপ্তাহ অন্তর সে সুবীরকে একশ' টাকা নোট ভাঙাতে দেখেছে। নিজে না হয় একটু কষ্ট করেই দেবে।

তার বাবার অসুখে কি সুবীরের এতটুকু দায়িত্ব নেই ?

আজই কলেজে বলতে হবে সুবীরকে।

ওকে ধরা বড় শক্ত। ও কখন যে কার সঙ্গে চলে যাবে বোঝা যায় না। বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দু' চার দিন ও যেতে দেখেছে।

কিন্তু সুবীর যখন নিজে ইচ্ছা করে ধরা দেয় তখন সুবীরের অফুরন্ত সময়। হয়ত দুটো ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নুপুরকে নিজের গাড়ীতে পাশে নিয়ে উঠোও। একেবারে ডায়মণ্ডহারবারের লাইনে কোন গ্রামের নির্জন পরিবেশে।

আজ ওকে কলেজে ধরতেই হবে।

মনে মনে ঠিক করে বেরোয় নুপুর।

কলেজে গিয়ে কিন্তু ও পায় না সুবীরকে। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা হয়।

এদিক ওদিক খোঁজে। চায়ের দোকান, কমন রুম, এ ক্লাস সে ক্লাস কোথাও আর বাদ নেই। কোথাও নেই সুবীর। রাস্তায় সুবীরের গাড়ী নেই।

নুপুর স্থির করে দুপুরে ওর বাড়ীতেই যাবে। নিশ্চয়ই বাড়ী আছে ও।

কিন্তু ওর বাড়ীতে যখন তখন যেতে বারণ করেছিলো সুবীর।

বলেছিলো, আমার একটি কথা রেখো। এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছাড়া আমার বাড়ীতে যখন তখন এসো না।

শুধিয়েছিলো ও,—কেন ?

সুবীর উত্তর দিতে একটু দেরী করেছিলো,—মানে, বাবা পছন্দ করেন না।

নুপুর আর কিছু বলেনি।

আজ দুপুরে যদি যায় কি আর ক্ষতি হবে।

ওর বাবা হয়ত একটু অপমান করে বসতে পারে।

তা করে করুক।

সুবীরকে ত' শেষ পর্যন্ত বাবার অমতেই নুপুরকে বিয়ে করতে হবে, ওর বাবা কি নুপুরের মত একটা গরীবের মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দিতে মত দিতে পারে

তবে ওর বাবাকে নুপুরের অত ভয় করবার প্রয়োজন নেই।

নুপুর ঠিক করে যাবে ও সুবীরের বাড়ী।

সুবীর যদি একটু রাগ করে করবে।

সুবীরের একটু আধটু রাগকে ঠাণ্ডা করবার ক্ষমতা ওর আছে।

বেলা ঠিক দুটোর সময় ও সুবীরের বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করে—যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে।

সুবীর খুব সিরিয়াস'লী মানা করেছে যখন তখন যেতে। তার ওপর যাচ্ছে টাকা চাইতে।

যদি সুবীরকে না পায়, তবে টাকা চাওয়াও হবে না। মাঝ থেকে সুবীর রেগে যাবে তার ওপর।

তবু টাকাটা যে তার আজই দরকার।

যদি না দেয় ?

না দিলেই হোল? এতদিনে তা হলে কি অধিকার এলো তার সুবীরের ওপর?

তবু নুপুরের ভয় ভয় করে। কেমন যেন বাধো বাধো লাগে যেতে।

মন যেন বার বার বলে, না গেলেই ভালো হোত।

না! ও সব দুর্বলতা।

নুপুর এসে পড়েছে সুবীরদের বাড়ীর সামনে।

পা-টা একটু কাঁপে। এত বড় বাড়ী। নিঝুম। সাড়া শব্দ নেই। চাকর বামুনগুলো রোয়াকে শুয়ে নাক ডাকছে।

কাউকে দেখতে পায় না নুপুর।

ওর হাত পা ঘামে।

তবু হন্ হন্ করে ও সটান্ চলে যায় সুবীরের বাইরের ঘরে।

বাইরের ঘরের দোর ভেজানো।

ডাকবে নুপুর?

নুপুর ভেজানো দরজাটা ঠেলে।

ভুত দেখলেও বোধ হয় অত চমকাতো না নুপুর। দেখে তাদেরই ক্লাসের বাণী সেন দরজার শব্দ পেয়েই সরে বসলো যেন।

সুবীর তার সামনে বসে মাথা ঝুঁকে ছিলো। মাথা তুলে নুপুরকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালো।

নুপুরের মাথাটা ঘুরে গেল যেন।

ফাল্গুনের সুতীব্র রৌদ্রের তাপে মুখটা ওর লাল হয়ে উঠেছিলো।

হাত পা ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো।

সুবীর চট্ করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে কঠিন কণ্ঠে বললে,—তুমি এখন এখানে কেন?

এত কঠিন গলায় যে সুবীর তার সঙ্গে কথা বলতে পারে নুপুরের ধারণা ছিল না।

প্রথমটা কিছু উত্তর দিতে পারে না নুপুর ভয়ে।

—এক গ্লাস জল দাও না বলছি।

সুবীর কঠিনতর কণ্ঠে বলে,—জল নেই। কেন এসেছো বলো?

—কিছু টাকা চাই সুবীর। রাগ কোরো না.—অনুনয় করে বলে নুপুর।

—টাকা কেন?

—বাবার অসুখ। চাই আজই।

—কত টাকা?

—দুশো। অন্ততঃ ধার দাও.—নুপুর অতি কষ্টে কান্না চাপে।

সুবীর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি ভাবে।

তারপর একটু নরম হয়ে বলে,—আজ ত' নেই। তুমি রোববার সন্ধ্যায় এসো।

—পরশু?

—হ্যাঁ, পরশু। আজ যাও। কিছু মনে কোর না বসতে বলতে পারলুম না।

মৌখিক ভদ্রতা!

নুপুরের ঠোঁট দুটো নীল হয়ে ওঠে। ম্লান হেসে প্রাসাদের গেট থেকে বেরোয়।

কয়েক মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল নুপুর যেন নিজেই বুঝতে পারছে না এখনও।

এক শূন্য ভাব এসে ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

সোজা কলেজ চলে আসে। বাড়ী যেতে ইচ্ছে হয় না। কি

হবে বাড়ী গিয়ে? টাকা ত' সে আজ জোগাড় করতে পারল না। তাছাড়া সুবীরের ব্যবহারটা এতই অদ্ভুত যে তার কোন কারণ চট্ করে খুঁজে পায় না নুপুর। বাণী সেন সুবীরের ঘরে দুপুরে কি করছিল কে জানে।

হয়ত নোট লিখে নিচ্ছিল, নয়ত আর কিছু?

সুবীরের ভালবাসায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে না নুপুর। তাদের এতদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মিছে নয়। জীবনের সত্যের সঙ্গে এ সত্য জড়িয়ে যাচ্ছে, এ মিথ্যে হতে পারে না।

তবু সুবীর কেন অত কঠোর হোল তার ওপর? কেন সুবীরের আগের রূপ এতই আকস্মিকভাবে বদ্‌লে গেল। নুপুর ত' সুবীরের এমন রূপ কখনও দেখিনি, কখনও নয়।

নুপুরের কি কোন অপরাধ হয়েছে?

হলেও কি ক্ষমা করতে নেই। সে ত' সুবীরের কত অন্যায় ব্যবহার ক্ষমা করেছে। প্রেমে যদি ক্ষমাই না এলো, তবে সে প্রেমের মূল্য কতদিন থাকতে পারে!

নুপুর ভয় পেয়েছে।

কে জানে কেন একটা অজ্ঞাত আতংক এসে ওর মনকে গ্রাস করেছে কলেজে পৌঁছে কলেজ করতে আর পারে না।

কোন মতে ক্লাসটা সেরে ও একা একা চলে যায় মাঠের দিকে। কলেজের সামনে মাঠে। সেখানে লোহার হাতলওলা বেঞ্চে চুপ করে একা একা বসে থাকে।

কি বিচিত্র পরিহাস সংসারের।

বাড়ীতে মা দাদা সবাই নুপুরের কথায় ভরসা পেয়ে বসে আছে টাকার অপেক্ষায়। অথচ একটা টাকাও তার কাছে নেই।

টাকা কিন্তু আজ তাকে জোগাড় করতেই হবে।

আবার ওঠে নুপুর।

ওখান থেকে সোজা ট্রামে উঠে বৌবাজারে চলে আসে।

একটা সোনা রূপোর দোকানে ঢুকে হাতের পাতলা সোনার চুড়ি দুগাছা খোলে। বাবাই দিয়েছিলেন এ চুড়ি।

হাতে শুধু থাকে সুবীরের দেয়া আংটিটা।

—দেখুন ত' ওজন করে!

দোকানের মালিক ওজন করে বলে,—কি হবে? বিক্রি?

ওরা মুখ দেখে টের পায়। গয়না বিক্রি করতে এসে মানুষের এক ধরনের মুখের চেহারা ওরা বহুকাল ধরে দেখে আসছে। কত মানুষ কত বিপদে, কত জুয়াড়ী কত জুয়ার মোহে, কত চোর ভয়ে ভয়ে এসে গয়না দেয়। মুখ দেখে ওরা ধরে বিক্রি করতে এসেছে।

তবে এমন বইখাতা হাতে বয়সের মেয়ে এসে হাত থেকে চুড়ি খুলে কখনও বিক্রি করতে এসেছে বলে মনে হয় না!

একটু অবাক হয় দোকানী।

হেসে বলে,—কত আর হবে। বড্ড খেলো। পান্ বাদ দিয়ে গোটা তিরিশ টাকা পাবেন।

নুপুরের টাকা আজ নিতেই হবে,—যা হোক দিন আমায়।

টাকা ক'টা নিয়ে হাতের থলেতে পুরে নুপুর আবার ট্রামে ওঠে। এবার বাড়ী।

টাকার জন্যে যে এমন অবস্থা মানুষের হয় নুপুর জানত না এর আগে। তা যদি জানত তবে এই সুবীরের কাছ থেকেই চাপ দিয়ে এর আগে সে বহু টাকা নিতে পারত।

বলতে গেলে সুবীর ত' তাকে এর আগে দু'একবার সেধেছিল টাকা নিতে।

প্রায় সাড়ে তিনশ টাকা ভর্তি ব্যাগ তার হাতে দিয়ে বলেছিলো। তোমার কাছেই রাখো।

নুপুর হেসে ফেরত দিয়েছিলো,—না, পরের জিনিষ অত লোভ করতে নেই।

—আমি পর হলুম!—তাতে আবার সুবীরের রাগ।

নুপুর হেসেছে একটু। উত্তর দেয় নি।

সেই সুবীরের আজকের ব্যবহার কে কল্পনা করতে পারে?

নুপুর ভয়ে অবাক হয়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও যেন লোপ পেয়েছে আজকের ঘটনায়।

সোজা বাড়ী এসে বাবার ঘরে যায়।

কেউ নেই। মা বসে বাবার মাথায় বাতাস করছেন! ঝুমুর পড়বার ঘরে।

নুপুর টাকা ক'টা মায়ের হাতে দেয়,—এই নাও! আবার রোববার দোব।

মা টাকা নিয়ে আঁচলে বাঁধে।

নুপুর আর দাঁড়ায় না। পড়বার ঘরে এসে ব্যাগ রেখে জুতো খুলে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে।

ঝুমুর মুখ তুলে তাকায়,—দিদি কখন এলি?

নুপুরের উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না।

ঝুমুর বলে,—শরীর খারাপ লাগছে বুঝি?

—হুঁ। বলে নুপুর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। আজকের মত ক্লান্তি তার কখনও জীবনে আসে নি।

হাত পা গুলো যেন অবশ করে আনে। কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব মাথাটায়! কিছু চিন্তা করতেও পারে না।

ঝুমুর বসে বসে পড়ে। বোধহয় কোন নাটক নভেল।

সন্ধ্যা প্রায় উৎরে যায়।

বাইরে কার ডাক,—রবীন আছো?

চমকে ওঠে ঝুমুর। ডাকটা ওর বুকের ভেতরে গিয়ে বেঁধে। সংসারে ত' কত ডাকই কানে আসে।

কিন্তু এমন একটি ডাক আসে না যা শোনা মাত্র বুক কেঁপে ওঠে।

ঝুমুর তাকায় নূপুরের দিকে। নুপুর ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে যেন।

ঝুমুর পা টিপে টিপে ওঠে।

আবার ডাক শোনা যায়,—রবীন আছো?

নাঃ! একটু সবুর নেই, ডাকছে ত' ডাকছেই। রাগ হয় ঝুমুরের। সদরে গিয়ে দেখে ঠিক যা ভেবেছে তাই। দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখে বিমল বলে,—বাবা কেমন আছেন?

—ভাল নয়।—বলে ঝুমুর।

বিমল এদিক ওদিক তাকায়,—একটা জরুরী কথা ছিল।

—কি?

—মা ত' বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন!

ঝুমুর চুপ করে থাকে।

বিমল একটু হেসে বলে,—কি যে মুস্কিল হয়েছে!

ঝুমুর গলা পরিষ্কার করে বলে,—কেন, বিয়ে করুন না।

—সেই ত' বলছি। বিয়ে করতে হলে তার আগে মানে—,

ঝুমুর সহজ হবার চেষ্টা করে,—মেয়ে কেমন?

—মেয়ে ত' সামনেই—কিন্তু—।

ঝুমুর এদিক ওদিক তাকায় কেউ শুনে ফেললে না ত'। এমন অসভ্যের মত কথা বলে!

ওর মনে খুসী উপ্‌চে পড়লেও বাইরে প্রকাশ না করে বলে,—আমার কথা ছেড়ে দিন।

বিমল চিন্তান্বিত মুখে বলে,—সেই ত' মুস্কিল। তোমার বাবার অসুখ—।

ঝুমুর চুপ করে থাকে।

বিমলই বলে,—যাক না আরও কিছুদিন।

ঝুমুরেরও প্রাণের কথা তাই। থাক না আরও কিছুদিন। এত তাড়া কিসের?

বিমল হঠাৎ বলে,—আমার মা যদি রাজী না হয়।

ঝুমুরের মুখটা শুকিয়ে যায়। তবু লাজুক ঝুমুর কথা বলতে পারে না।

বিমলই আবার বলে,—না হয়, সে দেখা যাবে!

ঝুমুর তেমনি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওপর থেকে কে নামছে। নেমে পড়েছে।

বিমল দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুমুরও।

ধীরেনবাবু নামছে। কাছে আস তেই বিমল বলে,—দাদাকে বলে দিও আমি ক্লাব ঘরে-ই আছি।

ঝুমুর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি বলে বোঝা যায় না।

ধীরেনবাবু চলে যায়।

বিমল আধা অন্ধকারে খপ্‌ করে ঝুমুরের একখানা হাত ধরে ফেলে।

—ধ্যেৎ!—বলে, হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ঝুমুর ভেতরে চলে আসে।

একটু লজ্জা নেই। যদি কেউ দেখে ফেলত!

ঘরে এসেও ওর বুকের ভেতর টিপ্ টিপ্ করে। যেখানটা বিমল ধরেছিলো, হাতের সেই জায়গাটা বার বার দেখে আর রাঙা হয়ে ওঠে। কেমন একটা আনন্দ হয় সেই স্পর্শের স্মরণে।

ঘরে এসে জানালা দিয়ে দেখে সদরে বিমল তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিনা!

না। চলে গেছে।

বাঁচা গেছে। ওকে দেখলেই ভয় করে। ডাকাত! কখন যে কি করে বসে ভাবতেই আতংক হয় ঝুমুরের।

নুপুর জেগেছে,—কি দেখছিস রে জানলা দিয়ে?

চমকে ওঠে ঝুমুর,—তুমি কখন উঠলে?

—কেন, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন? এই ত' উঠলুম।

ঝুমুর হাঁপটা জোর করে চাপে। বুকের টিপ্ টিপ্ যায় না।

—জানালায় কি?

—কিছু নয়। ওই ঘুগনীওলা যাচ্ছিল। ভাবছিলুম ডাকব নাকি।

নুপুর হাসি চাপে,—এ বেলা রান্না হবে না?

—না। রুটি আছে ওবেলার। গুড় দিয়ে খাব আমরা।

—বাবা কি খাবে?

—বাবার জন্যে মা কি করবে জানিনা। টাকা ত' নেই।

—টাকা এনে দিয়েছি।

ঝুমুর বলে,—তবে দাদা এসে হয়ত বাবার জন্যে কিছু আনবে।

নুপুর উঠে আসে এ ঘরে।

দেখে বাতাস করতে করতে প্রমীলাদেবী ঢুলে পড়ছেন ঘুমে।

পাখাটা হাত থেকে নিয়ে মাকে বলে নুপুর,—একটু ঘুমিয়ে নাও তুমি। পাখা আমায় দাও।

নুপুর মন্মথবাবুর কাছে বসে। বাতাস করে।

মন্মথবাবু নুপুরের মাথাটা হাত দিয়ে ধরে,—কে নুপুর!

—হ্যাঁ বাবা!

নুপুরকে মন্মথবাবু বড় ভালবাসেন।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন,—আর বাঁচব না মা।

নুপুর বাতাস করতে করতে বলে,—বাঁচবে না কেন? ভয় পেয়ো না।

বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

মন্মথবাবু চুপ করে পড়ে থাকেন। একটু পরে আবার বলেন,—ভয় কি জানিস্, মরে গেলে তোদের কি হবে?

—ওই সব বাজে কথা ভেবো না। চুপ করো।

কথাটা মিথ্যে বলেননি মন্মথবাবু। সত্যিই ত' বাবা মরে গেলে কি হবে ভাবতেই পারে না নুপুর। দাদা যে ক'টা টাকা পায় তার হাত খরচাতেই শেষ হয়ে যায়। বিশেষ কিছুই দেয় না সংসারে। যদি দেয়ও তাতেই বা কি হবে। খাওয়াও ত' চলবে না।

সুবীরের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

চুপ করে বাতাস করে নুপুর।

অকস্মাৎ ভগবানের কথাটা মনে হয়। ভগবানকে ডাকবার কোন প্রয়োজন আসেনি এতদিন তার জীবনে। আজ বিপদ আর হতাশায় ভগবানের কথাই স্মরণে আসে।

ভবিষ্যতের নিশ্চিত আশাগুলো যখন এক অজ্ঞাত শক্তির কবলে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। যা ভাবা গিয়েছিল, তা যখন হয়না, তখনই ত' মানুষ অজ্ঞাত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

নুপুর তাই বা সমর্পণ করতে পারছে কই!

দিন কাটে মাসটাও কেটে যায়। শিশিরকণার মাস কাবারী টাকা এলো না জব্বলপুর থেকে আজও। মাসের প্রথম দ্বিতীয় তারিখেই টাকা আসে, আর সাত তারিখ হয়ে গেলো, কিন্তু কোন চিঠি নেই, টাকা নেই। সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছে মধুসূদন আজ পর্যন্ত তার চিঠিও এলো না একখানা। চার পাঁচখানা চিঠি দিয়েছে শিশিরকণা; মায়ের জবানীতেও চিঠি দিয়েছে।

কিন্তু কই! কোন উত্তর নেই।

মানুষটার হোল কি?

রাত্রে শিশিরকণার ঘুম আসে না। দিনে কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেও পারে না। কথা বলতে ভুল হয়ে যায়। কাজ করতে ভুল হয়ে যায়। কেউ ডাকলে অনেকক্ষণ হয়ত ডাকই কানে যায় না।

দিনরাত্রি একই চিন্তা।

এমন অসহায় অবস্থা কল্পনা করতেও পারে না শিশিরকণা। যদি আর কখনও না আসে মধুসূদন, আর কখনও যদি টাকা না পাঠায়। বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে তার অবস্থা সংসারে কি দাঁড়াবে এ কথা কি চিন্তা করা যায়।

দাদার ওখানে গেলে দাদার বৌ-য়ের বকুনী খেতে খেতে মরে যেতে হবে, তার চেয়ে না খেয়ে মরাও ত' ভাল। রাস্তায় ভিখিরী দেখলে এখন শিশিরকণার বুক কাঁপে; তারও কি এই দশা হবে। দোরে দোরে ভিক্ষে করে পেট চালাতে হবে!

বৃদ্ধাও যেন অন্য মানুষ বনে গেছে। শিশিরকণাকে ডেকে শুধু বলে এক এক সময়,—আমারই দোষ মা। আমার দোষেই মধু দেশত্যাগী হোল!

—না আপনার আর কি দোষ, আমাদের কপাল!—শিশিরকণা

বরাতের দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা পায়। বৃদ্ধা চুপ করে শুয়েই থাকে বেশীর ভাগ সময়। নয়ত পূজো সন্ধ্যা করে সময় কাটায়।

না খেতে দিলে খেতে চায় না। না স্নান করবার কথা বললে স্নান করতেও মনে থাকে না তার। যেন স্থবিরা হয়ে এসেছে ক্রমশঃ।

আজ কিন্তু আর একটা পয়সাও নেই। একমুঠো চালও নেই ঘরে।

রাত্রে শিশিরকণার ঘুম হয়নি!

জানে যে কাল সকালেই উপোস করতে হবে। নিজের জন্তে কষ্ট নেই। উপোস করেই না হয় মরবে। বুড়ো শাশুড়ীকে কি খাওয়াবে—এই চিন্তায় ঘুম হয়নি ওর।

খানিকটা আটা আছে, ভেবেছে দুখানা রুটি করে দেবে, তাই না হয় চিবুবে বুড়ী।

বৃদ্ধা পূজো সেরে বলে,—উনুনে আগুন দিয়ে আর কি হবে।

শিশিরকণা ঠোঁটে আঙ্গুল দেয়,—চুপ করুন। মানুষ শুনবে।

গলা নামিয়ে বলে বুড়ী,—কি রাঁধবে?

দুবার ঢোক গিলে বলে শিশিরকণা,—শুধু জল হাঁড়ি চাপিয়ে দোব। তবু লোকে ভাববে ভাত হচ্ছে। বৃদ্ধার তালশাঁসের মত সাদা চোখদুটো জলে ভরে আসে,—কিন্তু ক'দিন এ ভাবে চলবে?

—যে ক'দিন চলে? শিশিরকণা তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয় পাছে চোখদুটো আবার দেখে ফেলে বুড়ী।

দুপুরে ফুলমণি কিন্তু ঠিক বেড়াতে আসে।

—কই বৌদি কইগো?

শিশিরকণা আঁচলটা পেতে শুয়েছিল রান্নাঘরে।

উঠে বসে।

ফুলমণি পান চিবোয়।

—বোস, খাওয়া হোল?—বলে শিশিরকণা।

ফুলমণি হাসে,—খুব খাওয়া হয়েছে। মাছের মুড়ো এনেছিল!

—কে?

—কে আবার। ওই খামখেয়ালী মানুষ। আপনাদের সমর।

—কেন হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়। ওর রেডিওওলা ওর মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে তাই।

শিশিরকণার মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বলে ফুলমণি,—তোমার মুখখানা কালো কেন? শরীর খারাপ নয় ত'?

—না।—ম্লান হাসে শিশিরকণা।

—দাদার খপর আসেনি?

—না।—ইচ্ছে করে বোধহয় জব্দ করচে আমাকে।—আবার হাসতে চায় শিশিরকণা।

ফুলমণি মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে বলে,—নিরুদ্দেশ হোল কিনা তাই বা কে জানে।

শিশিরকণা চুপ করে থাকে।

ফুলমণি শুধোয়,—আজ কি রাঁধলে?

শিশিরকণা চট্ করে মিছে কথা বলতে পারে না। মুখে বাধে।

—কিছু রাঁধোনি বুঝি।

—হ্যাঁ, ওই ভাত—আর—।

ফুলমণি চারিদিকে তাকিয়ে বলে,—আমাকে লুকিয়ো না বৌদি। আজ নিশ্চয়ই রাঁধোনি।

শিশিরকণা চুপ করে থাকে।

আঁচল থেকে একটা সিকি বার করে ফুলমণি,—এই নাও। এ পয়সা আমার। কিছু এনে খাও।

শিশিরকণা হাসে,—থাক ভাই। আশীর্বাদ করি ভাল ঘরে বিয়ে হোক। পয়সা লাগবে না!

—নাও না!—সাধে ফুলমণি।

—না থাক।—কিছুতেই নেয় না শিশিরকণা।

অগত্যা ফুলমণি চলে যায়। খবরটাও পাড়ায় চালু করতে হবে। পেট তার ফুলে উঠছে যে।

সে দিন সন্ধ্যে বেলায় প্রথমে সমরেনকেই বলে ফেলে,—শুনচো?

—কি ফ্যাচ ফ্যাচ করচিস!—বিরক্ত হয়ে বলে সমরেন চুল উল্টে আঁচড়াতে আঁচড়াতে।

—যা বলিচিনু তাই। ওঘরের বউ গো!

ওঘরের বৌয়ের নাম শুনে সমরেন ফিরে তাকায়,—কি ব্যাপার রে?

—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে, এখন খোঁজ পাচ্ছে না।

—সে কিরে?

—তবে না ত' কি। সোয়ামীকে অমন যা ন'য় তাই গালাগাল করা!

—ধুত্তোর সোয়ামী!—বিরক্ত হয় সমরেন,—খেতে পাচ্ছে না মানে কি?

—মানে আজ থেকে উপোস চলচে।

সমরেন আহত হয়,—বলিস কিরে! তুই শুনে চলে এলি!

সমরেনের এতটা সহানুভূতি ভাল লাগে না ফুলমণির। বলে,—তবে কি মোয়া নিয়ে খেতে সাধবো।

—আলবৎ। যা টাকা দিয়ে আয়।

ফুলমণি ঠোঁট উলটোয়,—ওঃ! টাকা একেবারে গাছের গোটা। যার বেশী হয় সে দিক। আমি পারব না।

সমরেন একটু ঝিমিয়ে আসে,—তা বলে না খেয়ে মরবে একটা লোক!

—রাস্তায় ত' কত মরচে—যাও না তাদের গে' টাকা দিয়ে এসো।

—তবু পাশের ঘরের লোক তাই বলচি। নে আমি দশটা টাকা দিচ্ছি, দিয়ে আয়।

ফুলমণি খেপে যায়,—খালি পরকে দেয়া। সেদিন ত' নীচের ঘরে ডাক্তারের ভিজিট দিলে, আজ আবার একে টাকা দিচ্ছ। কেন আমি বুঝিনা কিছু?

—কেন আবার।

ফুলমণি,—বলে,—মুখে ছাই পড়বে। লজ্জাও করে না পরের বৌ ঝির সঙ্গে অমন করে ঢলাঢলি করতে। তবু যদি তারা পুঁছত। সবাই ত' আর ফুলমণি দাসীর মত ভিখিরী নয়?

ফুলমণির গলা ভেঙে যায় রুদ্ধ আক্ষেপে।

সমরেন কড়া সত্যি কথাগুলো শুনে আরও নরম হয়ে আসে,—আমি কি তোকে ভিখিরী বলিচি!

ফুলমণি এবার উদাস হয়ে ওঠে,—যা খুসী করো গে যাও। তোমার টাকা তুমি জলে ফ্যালো। আমি বলতে যাবো কেন?

সমরেন চুপ করে থাকে।

ফুলমণি জানালাটা ভাল করে খুলে দেয়।

ফুর ফুর হাওয়া আসছে বসন্তের। ফাল্গুনের শেষ শিহরণ।

ফুলমণির বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

সমরেন ওর দিকে তাকায়।

ফুলমণি ভিজে চোখদুটো নীচু করে। ফুলো ফুলো গাল দুটো ওর ভারী সুন্দর মনে হয় আজ। সমরেন ভাল করে তাকায়। ফুলমণির মোটা খাটো শরীর খানাও বেশ আঁট সাঁট। ভাল লাগে।

ওর সাড়ীর একখানা আঁচলের পাড় ছেঁড়া।

—হ্যাঁরে তোর সাড়ী ছেঁড়া?

ফুলমনি কথা বলে না। হাঁটু মুড়ে জানালার উপর উঠে বসে।

মুখটা ওর গম্ভীর উদাস।

সমরেন সেধেই বলে,—ভাবচি ও মাসে একজোড়া তাঁতের সাড়ী দোব তোকে।

ফুলমণি গলে না।

—কি রঙ তোকে মানাবে বলবো? কচি কলাপাতা রঙ, গোলাপী পাড়।

ফুলমণি তাকায়ও না।

—কিরে কথা বলবি নে? চললুম তবে।

সমরেন ঘর থেকে বেরোয়।

শিশিরকণাদের ঘরের কাছে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় একটু সময়।

রান্নাঘরে আধশোয়া শিশিরকণাকে দেখা যায়। সমরেনের ভারী মায়া হয় দেখে। শুকিয়ে গেছে মুখখানি। কি সুন্দর বৌটি। দুদিনে যেন রোগা হয়ে গেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেন আকাশের তারা গোনে সমরেন।

বাসুদেবের ঘরে আলো জ্বলছে।

আলো জ্বলছে দেবযানীর ঘরেও।

শুধু শিশিরকণার ঘর অন্ধকার।

সমরেনের বড় কষ্ট লাগে। শিশিরকণা ফ্যালফেলে চাউনীটা ওর বুকে বেঁধে।

বৌটিকে বরাবরই ওর বড় ভাল লাগে। কেন যে কে জানে!

ও জানে বিবাহিতা শিশিরকণা। তার ভাল লাগাটা লোকের চোখে অন্যায়।

তবু ভাল লাগলে ত' কিছু করবার উপায় নেই।

ন্যায় অন্যায় বিচার করে ভাল লাগা না লাগাকে মনে মনে সংযত করা, অতখানি মানসিক বিচার বুদ্ধি হয়ত বা সমরেনের নেই।

তাই হয়ত আজ সন্ধ্যেবেলা এমন কাণ্ডটা করে বসে।

ও ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

আধশোয়া হয়ে ছিল শিশিরকণা।

নির্নিমেষ চোখে সমরেন শিশিরকণাকে দেখে।

শিশিরকণার প্রতিটি ভংগী ওর মনকে আছন্ন করে ফেলে এক অপরূপ মোহাবেশে।

সমরেন এক একবার চেতনা পেয়ে ভাবে একি করছে সে।

আবার আছন্ন হয়ে পড়ে। কিছুতেই সামলাতে পারছে না নিজেকে।

পা দুটো গুটি গুটি এগোয় রান্নাঘরের দিকে।

একি করছে সে?

থেমে যায় সমরেন।

আবার ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগে। অবশ করে তাকে যেন ওই দিকে টানে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শিশিরকণাকে দেখে সমরেন।

মাথায় ঘোমটা নেই। আঁচল গায়ে নেই, মেঝেয় পাতা।

অবাক নয়নে দেখে সমরেন।

শিশিরকণার গালের ওপর রুক্ষ চুলের গুচ্ছ ওড়ে বাতাসে।

গালের ওপর আঙুল দিয়ে চুল সরিয়ে দেয় শিশিরকণা। সে তাকিয়ে আছে সমরেনের উলটো দিকে।

তাই দেখতে পায় না সমরেনকে।

সমরেন থামে। কিছুতেই এগোতে চায় না।

তবু এগোতে হয়।

খুব কাছাকাছি এগোয় সমরেন।

ওর নিশ্বাসের শব্দে, না ওর উপস্থিতির অজ্ঞাত বোধে কে জানে শিশিরকণা ফিরে তাকায়।

—কে ?—চমকে ওঠে শিশিরকণা।

সমরেন ভয় পেয়ে যায় এবার।

উঠে দাঁড়ায় শিশিরকণা,—কে আপনি ?

সমরেন বলবার চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না,—এসেছিলুম—মানে টাকা নেবেন ? টাকা দিচ্ছি।

বলে পকেটে যে কটা টাকা ছিল বার করে শিশিরকণার দিকে দেয়।

টাকা দেবার মানেটা কিন্তু শিশিরকণার কাছে ঘৃণিত হয়ে ওঠে।

ও প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে,—ভদ্দরঘরের বৌঝিকে টাকা দেখাতে এসেচো ? অসভ্য জানোয়ার !

আকস্মিক গালিগালাজের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সমরেন।

ও কিছুতেই আর বোঝাতে পারে না যে টাকা ধার দিতে এসেছে।

—বেরিয়ে যাও !—রাগে কাঁপতে থাকে শিশিরকণা।

টাকাটা হাতে করে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে সমরেন।

ফুলমণি বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে আসে বাসুদেব মালতী, দেবযানী সবাই।

ফুলমণি এসেই সমরেনের হাত ধরে টানে,—চলে এসো।

শিশিরকণা তখন গর্জায়,—আমায় একা পেয়ে তুমি ঘরে ঢুকেছ? কুকুর কোথাকার!

ফুলমণিও গলা চড়ায়,—ও ভারী আমার ভদ্দরলোক! খেতে পাচ্ছ না দুটো টাকা ধার দিতে এসেচে। আর তুমি যা নয় তাই বলে গালাগাল কোরচ, কেন শুনি? তোমার খাই না পরি!

শিশিরকণার গলা কাঁপে রাগে, দুঃখে,—তোর কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না। কত বড় আস্পদ্দা ওর? ও আমার কাছে অন্ধকারে একা একা টাকা দিতে চায়।

ফুলমণি বলে,—ফের মিছে কথা বোলচ? টাকা ধার দিতে এসেছিলো ভাল বুঝে আর তুমি মিছিমিছি দুন্নাম কোরচ!

দেবযানী চটে,—ছেলেটাকে পুলিশে দেয়া উচিত।

—আপনার ফড়ফড় করে ফোড়ন দিতে হবে না।—গলা চড়িয়ে বলে ফুলমণি।

মালতী শিশিরকণার কাছে এসে বলে,—চুপ করো ভাই। চলো আমার ঘরে।

বাসুদেব ঘরে ঢুকে যায়।

দেবযানী ফুলমণির মুখের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, বোঝে। আর কিছু না বলে চলে যায়।

সমরেনকে টানতে টানতে ফুলমণি ঘরে নিয়ে আসে।

সমরেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফুলমণির দিকে একান্ত নির্ভরতা নিয়ে তাকায় আজ।

ফুলমণি ফোঁপায়,—কেন তুমি ওই ছোটলোকের মেয়েকে টাকা ধার দিতে গিয়েছিলে ?

সমরেন ফুলমণিকে যেন আজ পরিষ্কার করে দেখতে পায়।

ফুলমণি বলে,—হোল ত'! যা নয় তাই বলে গালাগাল করলে! তোমার এতে কিছু না হতে পারে, আমার লাগে। কেন লাগে তুমি কি বুঝবে ?

বলতে বলতে ফুলমণি আঁচল চোখে দেয়।

সমরেন ফুলমণির আঁচল ধরে চোখ থেকে নামায়,—এবার থেকে তোর কথাই শুনব ফুলমণি।

—কে বলেচে তোমায় আমার কথা শুনতে ? মেয়েমানুষের কথা শুনে চলতে লজ্জা হয় না ?

—ফুলমণির মনের ক্ষোভ নানা পথে প্রকাশ পায়।

—তবে কি কোরব বল ? বলে সমরেন।

—পুরুষ মানুষ ত'! নিজের বুদ্ধি নেই ? বোঝ না কে কেমন ?

কে কেমন ? সমরেন বোঝে কই! ওর ত' শিশিরকণাকে নারীর আদর্শ মনে হোত, ঝুমুরকে শ্রদ্ধা করবার মত মেয়ে মনে হয়। দেবযানী প্রণম্য। এগোতেই সাহস পায় না। ভাল মনে হোত না কিন্তু। ধারণাগুলো সবই হয়ত মিছে।

সমরেন নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে আজ।

ফুলমণির বুদ্ধি-ই তাকে নিতে হবে। ফুলমণি মেয়েমানুষ চেনে। তার চেয়ে অনেক বেশী চেনে। শুধু তাই নয়। তাকেও চেনে। দাদাকেও চেনে।

মেয়েটা এত ভাল কে জানত!

সমরেন চৌকীর ওপর বসে।

ফুলমণিকে ডাকে,—আয়!

ফুলমণি এগোয়,—কি?

—আমার ভয় করচে রে।

—ভয় কি?

—যদি ওরা পুলিশ টুলিশে খপর দেয়!

ফুলমণি হাসে,—খেপেচো নাকি! তুমি ত' অন্যায় কিছু করোনি অত ভয় কিসের?

সমরেন তবু জোর গলায় বলতে পারে না অন্যায় করিনি। মনের কোথায় যেন একটা দুর্বলতা ওকে চেপে ধরেছে। তবু মুখে বলতে হয়,—না, অন্যায় আর কি করেচি।

—তবে? টাকা দিতে গিয়েছিলে ওরই কষ্ট দেখে!

সঠিক তা' নয়। টাকা দেবার পেছনে যেন আরও অনেক মানে ছিল। তবু সেটা এত গোপন যে চেতন মনের স্তরেও তা ধরা পড়ে না।

—তা ছাড়া আর কি!—বলতে হয় সমরেনকে।

—তবে আবার ভয়টা কি?

ফুলমণি সমরেনের কাছাকাছি বসে।

সমরেন এগোতেই ফুলমণি চট্ করে সরে যায়।

—তুইও পালাবি?

—পালাবো কেন? এখন যে রান্না করতে হবে।

ফুলমণি যেতে চায়।

—শোন!—ডাকে সমরেন।

—কি?

—আমি একটু বেরোই। একটু বেশী রাতে ফিরব।

ফুলমণির কথাকে আর অবজ্ঞা করতে পারে না সমরেন। বলে,—আচ্ছা ঘণ্টা খানেকের ভেতরই ফিরব।

শিশিরকণাকে টেনে নিয়ে মালতী ঘরে আসে।

বসায় মেজেতে ওকে,—বোস। একটু জল খাও।

চিনি আর লেবুর সরবৎ এনে দে মালতী শিশিরকণাকে।

বাসুদেব ওদের দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মালতী বললে শিশিরকণাকে,—কি হয়েছে তোমার?

শিশিরকণা লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেলে,—আমায় টাকা দিতে এসেছে! আমায় ভেবেচে কি! কত বড় আস্পদ্দা দেখুন ত'! অন্ধকারে একা একা এসেচে আমায় টাকা সাধতে।

মালতী বলে,—সত্যি কথাই। কিন্তু টাকা দিতে হঠাৎ এলো কেন?

—ওই ছুঁড়িটার কাছে বোধহয় শুনেচে এ মাসে টাকা আসেনি!

—টাকা কি আসেনি সত্যি?

শিশিরকণা চোখ মোছে,—না। কোথায় যে গেল?

—তুমি বলেছিলে কিছু!

শিশিরকণা বলে,—মাকে ত' জানেন, মায়ের ব্যাভারে বিরক্ত হয়েছিলো খুব। তার ওপর আমিও একটু রাগ করেছিলাম।

মালতী হাসে,—তুমি আবার রাগ করতে গেলে কেন ভাই?

শিশিরকণা ভেজা চোখে হাসে,—মানুষের কি এক আধ সময় রাগ হতে নেই।

—কিন্তু অসময়ে হতে নেই।

শিশিরকণারও মনে আক্ষেপ আসে,—অত ত' বুঝিনি!

মালতী মৃদু হাসে,—পুরুষ মানুষকে বুঝতে পারো না, তবে মেয়ে হয়েছিলে কেন।

—আপনি পারেন ? হঠাৎ প্রশ্ন করে শিশিরকণা।

মালতীর মুখ গম্ভীর হয়ে আসে,—আমি ?

একটু চুপ করে থাকে মালতী।

শিশিরকণা বলে,—সব সময় কি মেজাজ বোঝা যায় ?

—মেজাজ কেন, মনও ত' ভাই সব সময় বোঝা যায় না।

শিশিরকণা মালতীর কথার ভেতর একটা বেদনার সুর লক্ষ্য করে। ওর কাণ এড়ায় না। ভাবে হয়ত' বা ছেলে পুলে হয়নি তাই মালতীর চাপা বেদনা, যেমন তার নিজের ?

ও শুধোয় মালতীকে,—কত বছর বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

—বিয়ে !—মালতীর মুখটা শুকিয়ে যায়।

পরমুহূর্তে হেসে বলে,—বহু দিন। প্রায় ছোট বেলায়।

—ওমা তাই নাকি। আমার কিন্তু সতেরোয়।

মালতী শুধোয়,—তখন তোমার বরের বয়েস কত ?

—পঁচিশ।

—কত বছর হোল ?

—বছর চারেক।

—মোটে।

—মোটে হোল। আমার ত' মনে হয় কত কাল হয়ে গেল।

মালতী মুচকী হাসে,—আর আমার কথা ভাবো দিকি।

ইতিমধ্যে বাসুদেব ঘরে ঢোকে।

মালতী হাসতে হাসতে শুধোয় তাকে,—হ্যাঁগা, আমাদের বিয়ে কত বছর হবে ?

শিশিরকণা কপালের ওপর ঘোমটা নামায়।

বাসুদেব একটু যেন অবাক হয় এমন হঠাৎ প্রশ্নে।

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ে,—বলো না। কত বছর হোল।

বাসুদেব শিশিরকণার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে। আস্তে বলে,—আমার মনে নেই।

বলে চেয়ারে বসে একখানা বই হাতে তোলে।

মালতী বলে,—তা' মনে থাকবে কেন? জানলে ভাই পুরুষ মানুষরা এমনি ধারা। ছোটবেলায় কোন এক হাবাতে মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তা' বলে দেবে, কিন্তু নিজের বিয়ের তারিখটা মনে নেই।

শিশিরকণা চোখ টিপে বারণ করে,—এমন করে বলবেন না।

—কেন বোলব না?

বাসুদেব মালতীর এমন অদ্ভুত ব্যবহারে রীতিমত বিস্মিত হয়। বৌটির সামনে মালতী যেন বড় বেশী মূর্খ-মুখরা হয়ে উঠেছে।

মালতী কিন্তু মানে না। বলে শিশিরকণাকে,—এই যে দেখচো ভিজে বেড়ালের মত বসে আছে; ওর জ্বালায় জীবনটা পুড়ে আঙার হয়ে গেল। ও কি কম!

শিশিরকণা ফিক্ ফিক্ করে হাসে। মনটা এতক্ষণে খুসী খুসী লাগে।

বলে,—এখন উঠি।

—শোন।—মালতী ওকে থামায়। পরে বাক্স থেকে দশটা টাকা বার করে শিশিরকণার হাতে দিয়ে বলে,—এই নাও। পরশু আবাব দোব। ধার কিন্তু। শোধ দিতে হবে।

—যদি না পারি।

মালতী হাসে,—না পারো ভাবব ছোটবোনের হাত খরচা দিয়েছি।

শিশিরকণা ভারী খুসী।

টাকাটা আঁচলে বেঁধে চলে যায়। শ্বাশুড়ীকেই একটু পাঠাতে হবে বাইরে নোটটা ভাঙাতে। ঘরে ঢোকে শিশিরকণা।

মালতী বাসুদেবে চেয়ারের পেছনে ঘেঁষে দাঁড়ায়।

সরে বসে বাসুদেব।

—আমি কি মেথরাণী যে ছোঁবে না?—হাসে মালতী।

বাসুদেব বিস্মিত হয়,—কি বোলছ? কি হোল তোমার আজ!

—হবে আবার কি? বিয়ে করবার বেলায় মনে ছিল না!

—বিয়ে! আমি?—বাসুদেব অবাক।

মালতী মুচকী হেসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—সবাই ত' বলে তুমি বিয়ে করেছ আমায়।

বাসুদেবও এবার হাসে,—তুমি কি বলো?

—আমি?—একটু বিপদে পড়ে মালতী।

বাসুদেব কথাটা পাল্‌টাবার জন্যে বলে,—পরশু টাকা কোথায় পাবে?

মালতী কথা উল্টে বললেও ভোলবার মেয়ে নয়।

ওকথার জবাব না দিয়ে বাসুদেবের চুলের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে মাথাটা ওর নিজের দিকে হেলিয়ে বলে,—আমি কি বলি তা' কি তুমি জানো না।

বাসুদেব অবাক হয় মালতীর ব্যবহারে। মালতীর আজ কি হোল?

কথা বলে না ও।

বাসুদেবকে ছেড়ে এবার মালতী বিছানা করতে থাকে গুনগুন করে গাইতে গাইতে।

হঠাৎ কি ভেবে মালতী বিছানাটা আজ এক সঙ্গেই করে। বাসুদেব দেখে। মালতীও টেরিয়ে দেখে। একটু হেসে বলে,—কি দেখছো?

—তোমার পাগলামী।

—পরে দেখো। আজ পাগলামী সইতেই হবে। খাবে এসো।

বাসুদেব গম্ভীর হয়।

খাওয়া সেরে চেয়ারে এসে বসে। একটা কথাও বলে না আর।

অন্যদিন মালতী আলাদা থালায় খায়।

আজ বাসুদেবের থালাতেই খেতে বসে।

বাসুদেব সেটাও লক্ষ্য করে। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও কিছু বলে না মুখে। ওর চাপল্যে একটু রাগও আসে বাসুদেবের মনে। এখন এমন কিছু ছেলেমানুষ নয় মালতী যে এমন একটা কিছু করে বসতে হবে। কারণটা পরিষ্কার দেখতে পায় বাসুদেব। মালতীর মনের ভাবছায়াগুলো কাঁচের ভেতরে দেখতে পায় যেন ও। শিশিরকণার মধুর আলাপ। তার স্বামীর ওপর এত ভালবাসা। সমরেনের অদ্ভুত আকর্ষণ। ফুলমণির চোখের মোহাবেশ মালতীর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। ওদের দৈনন্দিন টুকরো টুকরো কাজ টুকরো টুকরো কথা ওর ভাল লেগেছে। ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ওর মনের অবচেতনে ঈর্ষা দেখা দিয়েছে। ঈর্ষা থেকেই সে আজ ওদের চেয়েও বেশী কিছু করে ফেলার আগ্রহ সামলাতে পারছে না। ঈর্ষার জন্ম মনের তলায় যখনই টের পেলো, তখনই ওর সংযত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মালতী নেহাৎই মেয়েমানুষ! এত হালকা মালতী! বাসুদেব যে ভাবতেও পারেনি। এর চেয়ে ত অনেক বেশী সংযমের পরিচয় সে মালতীর কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু আজকে সে সংযমের বাঁধকে বুদ্ধির কঠোর পাষাণে বাঁধতে পারেনি মালতী। বুদ্ধি এলিয়ে গেছে, খসে পড়েছে ঈর্ষার আগুনে বহুদিন ধরে। আজ ধ্বসে পড়েছে বাঁধ।

আজ মালতীর মনের তলায় মধুর অসংযমের যা-খুসী ভাবখানা ফণা তুলেছে। সে ভাবের স্রোতকে মালতী বুদ্ধি দিয়ে আটকাতে পারেনি।

মালতী আজ একটু যা-খুসী করতে চায়। বাঁধ ভেঙে দাও। জোয়রে ভেসে যাক দুকূল। কিন্তু দুকূল ভাসাতে পারে না বাসুদেব। তাকে দাঁড়াবার স্থান রাখতেই হবে।

খাওয়া সেরে মালতী বলে,—আলো নিভিয়ে দোব। শোবে এসো।

বাসুদেব অসাধারণ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মালতী লক্ষ্য করেও যেন গ্রাহ্য করতে চায় না।

সামনে বাসুদেবকে আরও কিছু বলবার আগেই বাসুদেব দৃঢ় স্থির স্বরে বলে,—ভুলে যাচ্ছ মালতী।—তুমি বিধবা।

মালতী যেন চাবুকের ঘা' খেলো।

বাসুদেব তেমনই স্বরে বলে,—নিজের মনকে ফাঁকি দিলে শুধু ঠকতেই হবে জীবনে।

মালতী জানে। তবু জেনেও না জানবার চেষ্টা এ যেন মনের ধর্ম। সব বুঝেও ভাবের ঘরে চুরি করতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় ভুলে যাই জীবনের কোন কোন ব্যর্থ কাহিনী, কোন কোন কালো রাত দিনের কাহিনী। ভোলা যায় না। তবু বাইরের রংয়ে ঢাকবার চেষ্টা করতে ত' মানুষ ছাড়ে না।

মালতীও সাধারণ। সে অসাধারণ নয়। অসাধারণ হতে চায়নি। বাসুদেব কেন তাকে সাধারণ মেয়ে বলেই গ্রহণ করলো না। কেন তার এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলো না!

বাসুদেবেরই বা কি দোষ!

বাসুদেব ওদের দেশেরই ছেলে। যেদিন বাসুদেব রাত তিনটের ওদের বাগানে ঢুকে দেখা করেছিলো, বলেছিলো,—তুমি কেঁদোনা মালতী। চলো আমার সঙ্গে। তোমার জীবনকে ব্যর্থ হতে দোব না।

উজ্জ্বল উৎসাহ নিয়ে এসেছিলো বাসুদেব।

বাসুদেবের সঙ্গে কলকাতায় আসবার পরেও ত' কতবার বাসুদেব বলেছে,—বিয়ে করতে আমাদের বাধা কোথায় ?

মালতী বার বার তাকে ফিরিয়েছে। বার বার কঠোর আঘাত করেছে,—তা হয় না। কিছুতেই হতে পারে না।

—কেন হয়না মালতী ?—অনুনয় করছিলো ও।

—আমি যে বিধবা।—মালতী বার বার বলেছে। বাসুদেবের স্পর্শ এড়িয়ে এসেছে এতকাল মলিনতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে।

আজ বাসুদেবের কি দোষ।

ঢাকায় ত' বাসুদেব কতবার বলেছে ওকে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর,—বিয়ে কোর না। কিছুতেই নয়।

মালতী তখনও ওকে কঠিন ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছে,—বাবার কথা ফেলবার সাধ্য নেই আমার। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

বাসুদেব আর কিছু বলতে পারেনি। জানত' মালতী জিদ্ চিরদিনই বজায় থাকে। আজও থাকবে।

বিয়ে হোল মালতীর।

স্বামী রূপবান। বিদ্বান।

মনের সত্যকে হাজির করলে স্বীকার করতেই হয় মালতী অমন স্বামী পেয়ে সুখীই হয়েছিলো। খুব ভাল লেগেছিলো স্বামীকে। কেন কে জানে ?

স্বামীটি বড় ভালো মানুষ। বিয়ের পর মালতীর ওপর নিজের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত।

আরও ভাল লাগল মালতীর।

কিন্তু বেশীদিন নয়।

জাহাজে চাকরী কোরত স্বামী। মারা গেল।

মরবার পর মালতী কেঁদেছিলো। অধীর হয়ে পড়েছিলো।

বাসুদেবকে ভাববার অবকাশ এতদিন হয়নি।

এবার বাসুদেবের কথা মাঝে মাঝে মনে হোত।

তবু বাসুদেবের চেয়ে স্বামীর আসন সে অনেক উচুঁতেই রেখেছিলো।

বাসুদেব হঠাৎ এলো।

আবার দেখা হোল। আবার ভাল লাগল।

মাঝে মাঝে ভেবে বিস্ময় লাগে মালতীর নিজের মনের বিচিত্র গতি দেখে। মেয়েদের ভালবাসার আশ্চর্য অনুভূতিগুলো ওকে ভাবিয়ে তোলে।

নিজেই সে বুঝতে পারে না সে স্বামীকে ভালবাসে, না, বাসুদেবকে।

হয়ত অন্য কোন পুরুষ জীবনে এলে তাকেও ভালবাসতে পারত। বড় বিচিত্র।

এক বিন্দু ফাঁকি নেই অথচ।

সবই সত্যি, মিথ্যে একজনও নয়।

মালতী মনে মনে হাসে।

বাসুদেব এলো। মালতী যেন আর এক আশ্রয় পেলো।

বিধবা হয়ে সমাজে থাকায় ব্যর্থ অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ পেলো।

তবু বাসুদেবকে বার বার ফেরাতে হয়েছে, যখনই বাসুদেব এগিয়েছে খুব কাছাকাছি। এক প্রাচীর তুলে রেখেছিলো মালতী দুজনের ভেতর।

আজ সে প্রাচীর ভাঙলে বাসুদেব শুনবে কেন?

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে মালতী।

তারপর উঠে বিছানাটা আবার আলাদা করে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভেতর থেকে এক গভীর ক্লান্তি ওকে ডুবিয়ে দেয়। আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বাসুদেব উপন্যাস লিখেছে আবার।

সংসারে একজনের ভালবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আর একজনের নিষ্ঠুর খেলা চলতে থাকে। ভালবাসার দীপ্ত সত্যের কাছে সে খেলা যে কত খেলো সেই কি ছাই বোঝে? বোঝে না!

বুঝলে দেবযানী সেন এম্, এ-র এমন খেলার খেয়াল চাপত না।

রবীন বোঝে। বুঝেও ও দেবযানীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আমোদ পায়। এই বুঝি ভালবাসার ধর্ম। আশ্চর্য, একটুও রাগে না রবীন।

মাইনের সামান্য টাকা পেয়ে মাকে কিছু দিয়েছে রবীন আর বিমলের টাকা শোধ করতে রেখেছে পঁচিশ টাকা।

প্রমীলাদেবী জানে রবীনের মাইনের সামান্য কয়েকটা টাকায় ভাতও হয়ত চলবে না। তবু কিই বা বলবার আছে। যেটুকু খুচরো সোণা আছে বিক্রি করেই খেতে হবে এখন।

দেবযানীর ঘরে গিয়েছিলো রবীন। সে ডেকেছে।

ওকে দেখেই দেবযানী ভারী ব্যস্ত হয়ে বলে,—এতক্ষণে এলে। কি আক্কেল তোমার?

রবীন অপরাধীর মতই বলে,—কি কোরব। জানেন ত' বাবার অসুখ।

জুতো পরতে পরতে বলে দেবযানী,—এতক্ষণে বোধ হয় বেরিয়ে গেল বিনয়। ভেবেছিলাম ট্রামে গেলে ধরতে পারব।

রবীন চুপ করে থাকে।

—যেমন দেরী করে এসেচো, তার জরিমানা দাও ট্যাক্সি ভাড়া। ট্যাক্সি করে আমার পৌঁছে দেবে চলো।

—কোথায় ?

—তোমার মাথায়। বিনয়ের বাড়ী, গড়িয়াহাট।

রবীন চুপ করে।

—চলো, যাব ট্যাক্সি করে। তোমায় টাকা দিতে হবে।

রবীনের মুখটা কালো হয়ে ওঠে, ঠোঁটদুটো চেপে যায় আরও। বিমলের ধার শোধ করবার পুরো টাকাও নেই। কিছু টাকা দেবে আর কিছু বাকী থাকবে। সে টাকাটাও ট্যাক্সির পেছনে যাবে আজ।

বলে,—দোব টাকা। চলুন।

হাসতে হাসতে বেরোয় দেবযানী। পিছনে রবীন।

বাইরে গিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে ওঠে।

পথে দেবযানী শুধোয়,—টাকা আছে ত' তোমার কাছে ?

—আছে।

রবীন চুপ করে থাকে।

গাড়ীটা এগোয় বড় রাস্তা ধরে।

দেবযানী হঠাৎ রবীনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে ফিস্ ফিস্ করে,—কাছে এসে বোস।

রবীন দেবযানীর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়।

চঞ্চল মোহে আচ্ছন্ন দুটো চোখ।

রবীন একটু কাছে ঘেঁসে বসে।

দেবযানী খেয়াল খুসীতে উপ্‌চে পড়ে হঠাৎ আজ। রবীনের বলিষ্ঠ শরীরটার দিকে তাকায়।

আধবোঁজা চোখে তাকায়।

মাঠের পাশ দিয়ে ছুটছে গাড়ী।

বাতাসের ঝাপটা লাগে চোখে মুখে। বসন্তের নেশা মাখা বাতাস।

দেবযানী ওর সুন্দর দেহটি আলগা করে দেয়।

এলিয়ে পড়ে বলে যেন,—আরও কাছে।

রবীন স্থির, প্রশান্ত। দেবযানীর চোখের আগুন অসহ্য মনে হয় ওর।

পরিষ্কার বলে,—না।

ফোঁস করে ওঠে দেবযানী,—আসতে হবে।

—না।

দেবযানীর কণ্ঠে ধমকের স্বর এবার,—যা বলছি, শোন।

খপ্ করে একখানা হাত ধরে ও রবীনের।

রবীন এক মোচড়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ় স্বরে বলে,—না।

দেবযানী বিস্ময়ে চুপ করে যায়।

কঠিন স্বরে বলে,—তুমি কি চাও আমার কাছে। কেন আসো বারে বারে?

রবীন দৃঢ় অথচ আস্তে জবাব দেয়,—কিছুই চাই না। ভাল লাগে তাই আসি।

—কি ভাল লাগে? দেবযানীর প্রশ্নে কঠোর কৌতুহল।

রবীন সহজ জবাব দেয়,—জানি না। ভাবিনি।

দেবযানী একটু জেরা করেই বলে যেন ওকে জব্দ করবার জন্যে—আমায় যদি দেখতে না পাও?

রবীন নীরব।

—চিরকালই ত' আমাকে দেখতে পাবে এমন কথা নেই।

রবীন ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারে না, বিড় বিড় করে।

—কি হোল ? কথা বলো।

রবীন কিছু ভেবে একটু থেমে বলে,—দেখতে না পেলেও বোধ হয় ভালই লাগবে।

দেবযানী অবাক। ছেলেটার কথাগুলো এত অর্থহীন !

—মানে ?

—মানে ত' আমিই জানি না।

এত সহজ উত্তরগুলো অথচ মানে বোঝবার উপায় নেই। দেবযানী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ।

—তোমার সঙ্গে তামাসা করবার সময় আমার নেই।

ট্যাক্সি থামায় দেবযানী। সুন্দর মুখখানা ওর কঠিন হয়ে ওঠে।

বলে,—নামো। আর কখনও আমার ঘরে যাবে না। বারণ রইল।

রবীন মুখ নীচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

কি যে ভাবে কে জানে।

পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে বলে,—রইলো টাকা। কথা দিয়েছি ভাড়া আমি দেব। এটা নিতেই হবে। বলে দেবযানীকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে গাড়ী থেকে নামে।

নেমে হাঁটতে থাকে।

দেবযানী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়ে।

তারপর টাকাটা নিয়ে থলেতে রাখে। ঠিক হয়েছে ! পকেটে ওর একটি পয়সাও নেই।

হেঁটে বাড়ী ফিরুক। যেমন ইডিয়ট তার তেমনি শাস্তি হোক।

ট্যাক্সি আবার চলে।

রবীন একা একা হাঁটতে হাঁটতে এসে মাঠের এক নির্জন জায়গায় একটু বসে।

ফাঁকা মাঠের ঠিক মাঝে বসে পড়ে রবীন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

ফোর্টের পেছনে আকাশের রাঙা আভা তখন নিঃশেষ হয়ে যায়নি। চৌরংগীর কোলাহল বেড়ে চলেছে। তবু দূর থেকে শব্দগুলো ভারী মধুর মনে হয়। আলোগুলো ক্রমশঃ জ্বলে ওঠে। পূবের আকাশটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। পশ্চিমে সূর্য-বিদায়ের বিলীয়মান রেশ।

আবার রাত্রি। আবার দিন আসবে। আবার রাত্রি হবে।

এমন করে অনেকগুলো দিন রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে এ জন্মের ইতিহাস।

রবীন মাথার ওপর খোলা আকাশের দিকে তাকায়।

গভীর শূন্যতার আনন্দ আস্বাদ। এ আস্বাদের শেষ নেই। এ আনন্দের জন্ম মৃত্যু নেই। নিজেকে যদি বিলিয়ে দেওয়া যায় নিস্ব হয়ে এই আনন্দ আসরে। তবে ত' মৃত্যু থাকে না।

রবীন জানে দেবযানী এই আসরের খবর জানে না। দেবযানী নিঃস্ব হয়ে উঠতে পারে না। ওর মনকে টেনে রেখেছে মদের ইসারা। তার পরে কি আছে ভাবে না দেবযানী। শেষ হয়ে যাবার ভয় তার তাই বেশী। তাই ত' চায় যত শীঘ্র পারে সংসারের রসাহরণ করে স্বাদ মিটিয়ে নিতে।

রবীন ওর এই ক্ষিদের গহ্বরে পড়তে চায় না।

পারে না। ভয় হয়, বোধ হয় নিজেও সে দেবযানীকে হারাবে।

দেবযানীর বাইরের রূপ পাবে, কিন্তু হারাবে তার নিজের সৃষ্টি, তার মনে দেবযানীর ভাব সৃজনকে।

রবীন বেদনা পায়। তবু গভীর তৃপ্তি আছে সে বেদনার ওপারে। নিজেকে লুব্ধ মোহে ডুবিয়ে দেয়নি।

এ তৃপ্তি বড় কম না।

বেদনা যেটুকু, সেটুকু সমবেদনা, নিজের দুঃখে না, দেবযানীর বিকারে।

রবীন ধীরে ধীরে ওঠে।

গভীর অন্ধকার হয়ে এসেছে সমস্ত মাঠখানা। বিচরণে যারা বেরিয়েছিলো, তারা বাড়ী ফিরেছে।

আর বেশী মানুষ নেই।

রবীন ওঠে! উঠে আবার হাঁটতে থাকে। তাকে বাড়ী পৌছতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে দেবযানী রাগ মনে পড়ে হাসি পায়।

তাকে যেতে বারণ করেছে। বেশ ত'। যাবে না। কিন্তু রবীন নিশ্চিত জানে দেবযানীর এ রাগের মূল পুরো মিথ্যে। মিথ্যে যা তা টেঁকে না, টিকতে পারে না।

রবীনের হাসিই পায়।

দেবযানীর ইদানীং ব্যবহারে যে নির্লজ্জতা আর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তাও মিথ্যে। সত্য যা তার বিকাশ কোন একদিন হবেই।

যদি নাই হয়, রবীন জোর করবে না।

সেটা জোর করে লাফিয়ে আকাশ ধরবার আস্ফালনের মত হয়ে দাঁড়াবে।

ফল নেই কিছু। শুধু আস্ফালনই সার।

রবীন নিজের সমর্থ প্রেমে নিজেই পূর্ণ। তাকে ক্লেদাক্ত করবার জোর নেই কারও।

বাসুদেব থামে।

একবার তাকায় মালতীর দিকে। মালতী ঘুমোচ্ছে। নিজের চেতনার অস্থিরতার পর গভীর ক্লান্তির ছাপ ওর চোখে মুখে।

ঘুমোক। স্থির হোক মালতী।

পরিশুদ্ধ হয়ে উঠুক মনের ভাবকেন্দ্র।

বাসুদেব কলম রাখে।

ধীরে ধীরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারে শুয়ে পড়ে।

নুপুর ঠিক রবিবারেই গিয়েছিলো সুবীরের কাছে। যাবার কথা ছিল টাকা আনতে।

সন্ধ্যের একটু আগেই বেরোয় নুপুর। যাবার আগে আর সাজতে ইচ্ছে হোল না। কি হবে সেজে। নুপুর যে নিতান্তই গরীব, এ কথা আজও সুবীরের অজানা নেই।

অনর্থক অর্থের বড়াই নিতান্তই হাসির হয়ে উঠবে। পাউডার স্নো, রঙীন সাড়ী। দামী, বহু কষ্টে কেনা। এ সজ্জায় ত' আর প্রমাণ করা যায় না যে নুপুর গরীব নয়!

বরং এমন একটা বিসদৃশ সাজে যাদের টাকা আছে, তারা হয়ত' বা মুচকে হাসবে।

নুপুর যে সাড়ীখানা পরেছিল, সেইখানা পরে ভাবল, এই তার সত্য রূপ আর যা সত্য তাতে লজ্জা আসা অন্যায়।

যেতে যেতে মনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করে নুপুর মনটা আজ ভার ভার। মনের ওপর যেন এক অতিরিক্ত পাষাণের পেষণ।

মাথাটা ধরেছে আজ। দুপাশে অসহ্য যন্ত্রণা।

নিজেকে বড়ই ছোট মনে হয় যেন। সে ত' ইচ্ছে করেই ছোট হচ্ছে না। চারিদিকের এক অবধারিত চাপে তাকে জোর করে এমন করে তুলেছে।

বলতে গেলে সে ভিক্ষে করতেই চলেছে।

টাকা ভিক্ষে, তবু ভাগ্যি ভালবাসা ভিক্ষে নয়।

টাকার দিক থেকে ছোট হওয়া পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কাছে চিরদিনই অসহনীয়। ওরা টাকা আর সোনার দেমাক করতে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয় করে টাকার অভাবকে। ওটা যেন সইতেই পারে না।

নুপুরের নিজের কাছেও এটা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বন্ধুর কাছে কিছু টাকা ধার চাইতে যাওয়া কিছুই সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। ছেলেরা হাসতে হাসতেই হামেশা চেয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েরা? কেন যে ওরা পারে না! মা যে এত অত্যেচার করছে আজীবন বাবার ওপর। এর পিছনে জীবনে টাকার ব্যর্থতা ছাড়া আর কিই বা আছে! প্রমীলা দেবী আর সব সইতে পারেন, কিন্তু বিশেষ করে আত্মীয় পড়শীদের কাছে টাকায় ছোট হওয়া এ যেন অসহ্য তার কাছে।

লজ্জা আর ধিক্কার এসে নুপুরকে যেন নুইয়ে দিচ্ছে। তবু যেতে হবে। সেদিনের ব্যবহারের একটা জবাব অন্তত শুনে আসতে হবে। বাণী সেনের সঙ্গে নির্জন আলাপে তার আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি আছে তার ভালবাসাকে অপমান করতে চাইলে।

নুপুর এসেছে ওদের বাড়ী। ফটক পার হয়ে সুবীরের ঘরের দিকেই এগোয়।

এই ত' সুবীর!

সুবীরের সঙ্গে অমলা!

নিরাভরনা নুপুরের চোখ ঝলসে যায় পিঙ্গলাক্ষী অমলার সাজ বাহুল্যে।

সত্যিই স্বপ্নের রাজ কন্যার মত মনে হয় অমলাকে।

পাশে বলিষ্ঠ সুবীর। অপরূপ মিল।

নূপুর যেন কুঁকড়ে ওঠে।

গলা ধরে আসে অমলার সামনে কথা বলতে।

ওকে দেখে সুবীর এগিয়ে আসে। অমলা কথা বলে না। সে-জন্য গিয়ে সুবীরের গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে অন্যদিকে তাকিয়ে। যেন নূপুরকে চিনতেই পারেনি। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। সুবীর সামনে এসে শুধু বলে,—আজ একটু ব্যস্ত আছি।

নূপুর অতি কষ্টে নিজেকে সামলায়। বলে,—কথা দিয়েছিলে—।

কথা শেষ হবার আগেই সুবীর বলে ওঠে,—আজ কিছু হবে না। আজ যাও।

নূপুরের মুখটা পাংশু হয়ে ওঠে! শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করলে না সুবীর!

নূপুর তবু বলে,—একটা কথা ছিল।

—কি?

—একটু এদিকে আসতে হবে।

চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে নূপুরের।

সুবীর নিতান্ত বিরক্ত হয়ে অমলার দিকে তাকিয়ে বলে,—গাড়ীর ভেতরে বোস। এখুনি আসচি। নূপুরের দিকে তাকিয়ে বলে,—চলো।

ওরা ঘরে আসে।

নূপুরের চোখমুখ জ্বালা করছে,—তুমি আমায় অপমান করলে কেন?

—অপমান! এর চেয়ে সম্মান কি আশা করো?

—যাকে ভবিষ্যতে সঙ্গিনী করবে বলে কথা দিয়েছ, তাকে যার তার সামনে যা নয় তাই বলতে একটুও বাধে না তোমার?

—সঙ্গিনী!—হাসে সুবীর,—তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে!

স্তম্ভিত হয়ে যায় নুপুর। কথা বলতে পারে না কিছু সময়।

সুবীর একটা সিগারেট ধরায়,—দেরী হয়ে গেল চললুম।

নুপুর দৃঢ় স্বরে বাধা দেয়,—দাঁড়াও।

সুবীর দাঁড়ায়। নির্লজ্জ, নির্ভীক।

নুপুর আঙ্গুল থেকে আংটিটা খোলে,—এটা দিয়েছিলে কেন। একি মিথ্যে?

সুবীর হাসতে হাসতে আংটিটা হাত পেতে নেয়, পকেটে রাখে,—এই নিয়ে ছ'বার ফেরত এলো আংটিটা।

—আরও ছ' জন ফেরত দিয়েছে?—নুপুরের পা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন।

—তোমার মত আরও ছটি বোকা সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে ফেরত দিয়েছে। তারাও জানত তারা আমার সঙ্গিনী হবে।

নুপুর জ্বলে ওঠে,—তুমি জানোয়ার!

—না। আমি বুদ্ধিমান মানুষ!—হাসে তবু সুবীর।

—এতদিনের পরিচয় অভিনয়?

—মোটেই নয়।

—তবে?

—তখনকার মতো সেটা সত্যি। সত্যিই তখন তোমায় ভাললাগত।

নুপুর ডুবতে ডুবতে যেন কিছু একটার নাগাল পায়,—তবু বলে,—মিছে কথা বলতে লজ্জা হয় না তোমার?

—মিছে কথা ত' নয়। তখন তোমায় সত্যিই ভালবাসতাম। তা'বলে যে চিরজীবন ধরে ভালবাসতে হবে এখন কোন কথা নেই।

—যা সত্যি, তাকি চিরদিনই সত্যি নয়?

আজ যা সত্যি কাল সেটা মিথ্যে হতে ত' কোন বাধা দেখছিনে।

নূপুর শ্রান্ত হয়ে পড়ে,—মিছে তর্ক করতে চাইনে। তোমার কি আর কিছুই বলবার নেই।

—না। আসি আমি। টাকাটা তুমি আজই নিয়ে যেতে পারো আর দিতে হবে না।

নূপুরের কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়েছে।

সুবীর পকেট থেকে চেক বই বার করে লিখতে থাকে বলতে বলতে,—কিছু মনে কোর না। ক্যাশ নেই।

অপমানেরও একটা সীমা আছে।

সুবীর চেকটা ছিঁড়ে নূপুরের দিকে তাকায়।

নূপুরের দু চোখের জল গড়াচ্ছে গাল বেয়ে।

সুবীর একটু অবাক হয়,—কি হোল ?

নূপুর চোখের জল মুছতে থাকে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে।

ওকে একটু কাঁদবার সময় দেয় সুবীর।

তারপর বলে আবার,—টাকাটা নাও।

নূপুর আর একটা কথাও বলে না। যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

সুবীর আর একবার বলে হাসতে হাসতেই,—টাকাটা তাহলে নেবে না ?

ঘৃণায় কুঁচকে ওঠে নূপুর।

পালাতে পারলে ও বাঁচে যেন।

দ্রুত পায়ে ফটকটা পার হয়ে ও রাস্তায় পড়ে।

সুবীর পেছনে দাঁড়িয়ে চেকটা ছিঁড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে। তারপর সেটাকে মুড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে,—যাক্।

এগিয়ে এসে অমলার সঙ্গে গাড়ীতে ওঠে।

নুপুর হেঁটে চলেছে। পাশ দিয়ে ওদের গাড়ীখানা বেরিয়ে যায়। অমলার খিল খিল হাসির শব্দ কানে এসে লাগে নুপুরের।

চোখের জল সামলাতে হয়। রাস্তার লোক কি ভাববে।

বাড়ী যাবে কিনা ভাবে নুপুর। বাড়ী গিয়ে টাকা না দিতে পারলে কি অবস্থাটা হবে কল্পনা করে নুপুর ভয় পায়। আতংকে বেদনায় হাত পা অবশ হয়ে আসে।

তার কাছে এখন আর একটা পয়সাও নেই বাড়ী যাবার। হেঁটেই ফিরতে হবে। বাড়ী ফিরতে মন চায় না। কোথায় কোন নির্জন কোনে বসে অজস্র কাঁদতে পারলে যেন বাঁচত নুপুর। কিন্তু পৃথিবীতে একলা চুপ করে বসে থাকবার মত একটুকরো জায়গাও কি নেই?

কোথাও একটু একা একা বসতে দেখলেই কতকগুলো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি বিঁধবে গায়ের চারপাশে। সহর কলকাতায় নুপুরের মত মেয়ের একা একা বসবার মত নির্জন পরিবেশ কই?

নুপুরকে যেতেই হবে বাড়ীতে।

বুকটার ভেতর কেমন করতে থাকে। মাথাটা ভারী মনে হয়। মনে হয় যেন হেঁটে হয়ত বা ও বাড়ী পৌছোতেই পারবে না। জীবনের এক অধ্যায়ের শেষ হোল আজ। দরিদ্রের জীবনে বসন্তোৎসবের পরিণাম বুঝিবা এখনিই মর্মান্তিক হয়।

নুপুরের জীবনে বসন্ত আসতে নেই। ওরা গরীব। ওদের জন্যে বসন্ত বোবা হয়ে যায়। গুমরে গুমরে মরে বস্তীর অথবা ভাঙা বাড়ীর আনাচে কানাচে, মনের অলিতে গলিতে। অপরূপ হয়ে ওঠে না, বিকশিত হতে পারে না সারাটা জন্ম। একি জনমের অভিশাপ, না যুগের?

নুপুর এই মুহূর্তেই ঘৃণা করতে পারছে যেন সুবীরের ধনগর্বের চাপা

অহংকারকে—যার জন্যে সে গরীবের মেয়েগুলোকে নিয়ে পুতুল খেলা করা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।

সংসারে সুবীরের দিন কি ফুরোবে না ?

নুপুর যতখানি বেদনা কুড়িয়েছে, তার চেয়ে বেশী অনুভব করছে সুবীরের ওপর ঘৃণাকে। এমন একটা মনহীন পাষাণ পুরুষকে সে ভালবেসেছিলো। তার উপযুক্ত পাওনা আজ মিটে গেছে। কিন্তু সুবীর জীবনে যে দেনা করে চলেছে, তা শোধ করতে হবে ওর জন্ম জন্ম ধরে আগামী কালে।

নুপুরকে নূতন দিন পেতে হবে। আগামী কাল থেকে সুবীরের দুর্দিনের ইতিহাসকে জীবন থেকে মুছে ফেলতে হবে। নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে নিজের সত্যি পরিবেশে।

নূতন নুপুর জন্মালো। অতীতকে মুছে ফেলবার সামর্থ্যর সন্ধান পেয়েছে নুপুর। জীবনকে যেন আজ ঠিক মত দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে কতখানি সত্য আর কতটুকু মিথ্যে। এবার আর মিথ্যে নয়। স্থির সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে দিনরাতের বেদীতে।

নুপুর হাঁটতে হাঁটতে নূতন শক্তি পায়। মনের কোথা থেকে জোর পায় যেন ও। মনে হয় অন্যায় ও করেনি, ভেঙে পড়বার কথা ওর নয়। ও কেন নুয়ে পড়বে। না। কিছুতেই নয়। সোজা হয়ে চলে নুপুর। ভয় করে না আর কাউকে। কোন অভাবই আজ আর তাকে ভেঙে ফেলতে পারবে না।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে ও দেখতে পায় বিমলকে। বিমল বোধ হয় ঝুমুরের সঙ্গেই কথা বলছিলো। বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে ওর, ঝুমুরও ভুল করছে না ত'? তাকে দেখেই বিমল উল্টো দিকে ঘুরে চলে যায়। ঝুমুরও টুক্ করে সরে পড়ে ভেতরে।

নুপুর বাড়ী ঢোকে। সোজা গিয়ে বাবার কাছে বসে। বাবার কাছে না বসতে পারলে আর শান্তি পারে না আজ।

—এখন কেমন আছো বাবা ?

মন্মথবাবু তাকায়,—ভাল নেই মা। কখন এলি ?

—এই এলুম। মা কই ?

মন্মথবাবু জবাব দেন না। প্রমীলা দেবীর কথা যেন সইতে পারেন না মন্মথবাবু।

চুপ করে বসে বসে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। হাত পা টিপে দেয়। বাতাস করে।

ভারী আরাম লাগে। বড় শান্তি লাগে। ইচ্ছে হয় আজ বাবাকে বলে ফেলে সব কথা। বাবার কাছে বসে বসে খুব কাঁদে।

কিন্তু তা ত' সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় নুপুরকে।

ঝুমুর পড়বার ঘর থেকে বেরোয়,—কখন এলিরে দিদি ?

নুপুর কথা বলে না। ন্যাকার মত জিজ্ঞেস করতে এসেছে। নুপুর যেন আর দেখেনি বিমলের সঙ্গে ওকে গল্প করতে !

ঝুমুর নুপুরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে,—একি দিদি। তোর কি হয়েছে ?

শরীর খারাপ ? মুখটা এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

নুপুর চমকে ওঠে যেন ধরা পড়বার ভয়ে,—কই, না। শরীর খারাপ না ত'! বোধহয় হাঁটাহাঁটিতে অমন—।

মন্মথবাবু বলেন,—শরীর খারাপ হলে ও ঘরে গিয়ে শোও গে মা !

—না বাবা, কিছু হয়নি ত',—বলে নুপুর।—মুখ কি একটু শুকোতে নেই ! কি আশ্চর্য !

ঝুমুর পাশে বসে।

নুপুর বলে,—যা না, মায়ের কাছে রান্নাঘরে গিয়ে একটু কাজ ক'রগে যা!

ঝুমুর আস্তে আস্তে বলে,—রান্না আর কি হবে?

মন্মথবাবু শুনতে পান। কিই বা বলবেন!

নুপুর বোঝে।

উঠে পড়ে ওখান থেকে। পড়বার ঘরে আসে।

পড়বার ঘরের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে পশ্চিম আকাশ ক্রমে কালো হয়ে আসচে।

আলোটা জেলে হাতমুখ ধুয়ে আসে নুপুর।

প্রমীলাদেবী কলতলায় আসেন। নুপুর ভয়ে কথা বলতে পারে না মায়ের সঙ্গে।

প্রমীলা বলেন,—কখন এলি?

—একটু আগে মা।

হঠাৎ নজর পড়তে বলেন প্রমীলাদেবী,—তোর হাতের চুড়ি কি হোল রে?

নুপুরের মুখ শুকিয়ে যায়।

সত্যি কথাই বলতে হয়,—বিক্রি করে দিয়েছি মা। টাকা এনে দিলাম সেদিন।

—অ! টাকা ধার পাসনি কারো কাছে।

সুবীরের মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে মুহূর্তে।—না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমীলা চলে যেতে চান,—দেখি রবি আজ কিছু আনবে বলেছে। ঘরে কিছু নেই।

নুপুর উত্তর দেয় না।

প্রমীলা ঘরে চলে যায়।

নুপুর অনেকক্ষণ হাত মুখ ধোয়।

চোখে জল ছিটোয়,-তবু যদি চোখের জল ঢাকা পড়ে।

কলতলায় দাঁড়িয়ে অজস্র কাঁদতে হয় নুপুরকে। বুকের বেদনা গলে পড়ে চোখের কোন বেয়ে।

এতক্ষণে একটু আরাম পায়।

হাত দুটো দিয়ে চোখদুটো কচলে ফিরে তাকায়।

ঝুমুর দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় অনেকক্ষণ। গা ধোবে।

চমকে ওঠে নুপুর।

দীর্ঘ চোখের পল্লবের নীচে চোখদুটো রাঙা হয়ে উঠেছে।

ঝুমুরের নজর এড়ান যায় না।

ঝুমুর বুঝেছে, ঝুমুর সব জানে। দিদিকে এমন কাঁদতে কখনও দেখেনি ঝুমুর। দিদিকে বড় ভালবাসে। দিদির কোন এক দুঃখের মাপটা অনুমান করে ওর বুক ভরে ওঠে সমবেদনায়।

দিদির কাছে এসে ভার ভার গলায় বলে,—কাঁদছিস কেন ভাই দিদি? কি হয়েছে?

—কিছু না।—নুপুর আর সামলাতে পারে না। ওর সামনেই চোখের জল গড়ায়।

ঝুমুরের নরম মনের ওপর দিদির বেদনার তরংগ ওঠে।

ওর চোখ ছল ছল করে,—কি হয়েছে বল আমায়। বলতে হবে।

—কিছু নয় রে!—বলে ভেতরে চলে আসে নুপুর। সোজা পড়বার ঘরে।

ঝুমুর পিছন পিছন আসে। এসে দোরটা এঁটে দেয়।

—বল না। কি হোল তোর?

নুপুর আবার চোখ মোছে।

ঝুমুর নুপুরের কান্না সইতে পারে না। বড় নরম মেয়ে ঝুমুর। ওরও যেন কান্না পায়।

নুপুরকে কিছু বলতে হয় না।

ঝুমুর বলে,—কিছু কিছু ত' বুঝতে পারি দিদি। আজ কি বলেছে।

—অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। জানিস আমরা গরীব বলে—বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে নুপুরের।

ঝুমুর ওর বড় আপনার। তাই ওর কাছে বলতে পারে নুপুর।

আশৈশব দুজন একসঙ্গে মানুষ হয়ে আসছে! ঝগড়া যেমন করেছে, ভালও তেমনি বেসেছে। ঝুমুরকেই ত' একথা বলা যায়। আর কাউকে ত' বলা যায় না। বান্ধবীদের ত' নয়ই। তারা শুনে মনে মনে হয়ত বা খুসী হবে। হাসতেও পারে বা।

ঝুমুরের মত নুপুরের চোখের জল আর কার বুকে বাজবে।

নুপুর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মাদুরের ওপর।

ঝুমুর ওর পাশে বসে পিঠে হাত রাখে।

ভয় হয় ওর বিমলও ওকে কোনদিন অপমান করবে না ত'! তাকে তুচ্ছ করে চলে যাবে না ত' অন্য কারো কাছে বা অন্য কোথাও।

বিমল কি তেমন হবে?

তবু বিশ্বাস নেই আর। বিমলকে বলতে হবে কবে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে।

এ বাড়ীর অভিশাপ আর ভাল লাগছে না ঝুমুরের।

দাদার আকস্মিক পরিবর্তন। কারো সঙ্গে কথা বলে না, চুপচাপ আসে, খায়, চলে যায়।

কি করে কোথায় যায় কেউ বিশেষ জানেই না।

বাবা রোগে শয্যাগত। মায়ের দিবারাত্র চীৎকার।

নিদারুণ অভাব। প্রতিদিনের ভাতের চিন্তাই মুখ্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

নুপুরের এমন দুর্ভাগ্য!

এর পর ঝুমুরের কি ভাল লাগতে পারে?

ঝুমুর চলে যাবে। এবার সে বিমলকে বলবে, তাকে নিয়ে যাক এখান থেকে—অন্য কোথাও। চলে যাবে সে বিমলের সঙ্গে।

নুপুর ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ঝুমুর শুধু বলে,—কাঁদিসনে দিদি। অ, দিদি, কাঁদিসনে।

নুপুর ভেঙে পড়েছে যেন কান্নায়।

ঝুমুরের হাত খানা টেনে নেয় নিজের কাছে।

ঝুমুর আবার বলে,—দিদি চুপ কর। কাঁদিসনে।

আর কিই বা বলবে ঝুমুর।

দিদির কষ্টে কষ্ট পেতে পারে, আর কি শক্তি আছে ওর?

নুপুর অনেক পরে উঠে বসে। চোখ মোছে।

ঝুমুর একটু স্বস্তি পায় যেন।

নুপুর ঝুমুরের কাঁধটা জড়িয়ে ধরে বলে,—আমার পড়া আর হবে না ঝুমুর।

ঝুমুর জানে। কি করেই বা হবে? অর্থাভাব তীব্র হয়ে উঠছে দিনের পর দিন।

—আমারও ত' হবে না।—বলে ঝুমুর।

নুপুর বলে,—না, তোর হবে! তোর হতেই হবে। তোর পড়বার খরচ আমি দেব।

—কোত্থেকে দেবে?

—চাকরী কোরব ঝুমুর। আমাকে রোজগার করতেই হবে। তোদের ক্লাসের মেয়েদের ভেতর দেখিসত' যদি টিউশানী পাওয়া যায়।

ঝুমুর চুপ করে থাকে।

—তাছাড়া কোন মাস্টারী বা যে কোন চাকরীর খোঁজ করতেই হবে।

ঝুমুর চুপ করেই থাকে।

নুপুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—এ ছাড়া আর কি উপায় আছ বল!

ঝুমুর ত' জানে কি বা উপায় আছে।

—তুই কি বলিস্?

ঝুমুর বলে,—তাইই করো। দেখো যদি চাকরী পাও!

—হ্যাঁরে। ওপরের দেবযানীকে বোলব।

—না, ওর বড় দেমাক। আমাদের সঙ্গে ত' কথাই কয় না।

—নাই বা কইল। এখন ত' দেমাক দেখালে চলবে না ভাই। চাকরী জোগাড় করতেই হবে।

ঝুমুর অনিচ্ছা সত্বেও বলে,—বলে দেখতে পারো! তার চেয়ে বরং মালতীদিকে বলো না!

—তা বরং বলা যায়,—

পরামর্শ করতে থাকে ওরা দুজন।

ঝুমুরের বেশী কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। ভয় হয়ে গেছে ওর বিমল যদি ওকে দিদির মত অবস্থা করে। তা হলে' কি হবে?

ভোর বেলা দোর খুলে দিয়েছে রবীন। লোকটি বিছানা বাক্স নিয়ে সোজা ওপরে উঠে গিয়ে শিশিরকণার ঘরের দোরে ধাক্কা দেয়। রবীন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আবার ঘরে চলে যায়।

বার বার ধাক্কা।

শিশিরকণার ঘুম ভেঙ্গেছে,—কে ?

—আরও জোরে ধাক্কা। শব্দ হয় দোরে।

—কে ?—আতংকে ভয়ে শিশিরকণা কাঠ হয়ে যায়। কে আবার এলো এত ভোরে। সমরেন ছোঁড়াটা নয়। গুণ্ডাপানা ছেলেটাকে দেখলে ভয় করে শিশিরকণার।

উত্তর নেই। দোরে শব্দ।

অগত্যা দোর খুলতে হয়।

ভোর হতে তখনও কিছু বাকী। আধা অন্ধকারে আকাশের কয়েকটি নক্ষত্র তখনও অস্ত যায়নি। নিঝুম বাড়ীতে কোথাও কেউ নেই।

লোকটি শিশিরকণার হাত ধরে টানে।

বাইরে রান্নাঘরের পাশে এসে দাঁড় করান। শিশিরকণা ওর কাঁধের ওপর মাথা রাখে।

দারুণ অভিমান জল হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

মনে ভাষায় তরংগ উঠে মুহুর্মুহু।

—কেন তুমি চলে গিয়েছিলে ? কেন টাকা দাওনি ? কেন চিঠির উত্তর দাওনি ? বোঝ না আমাদের কি করে দিন রাত কেটেছে ?

কিন্তু একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোয় না।

মধুসূদন ওর মাথায় হাত রেখে বলে,—রাগ কোর না। সব কথা না শুনে রাগ কোর না।

একশ' বার রাগ করবে শিশিরকণা। রাগ আবার করবে না!

মধুসূদন নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,—মাকে ডাকো।

শিশিরকণা যেতে চায় না। ভয় হয় আবার পাছে পালিয়ে যায়।

—কই যাও।

শিশিরকণা বলে,—তুমিও চলো ঘরে।

মধুসূদন বোঝে, হাসে,—চলো।

ঘরে গিয়ে শিশিরকণা ঘোমটা টানে খানিকটা।

বুড়ী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বেলা হয়ে গেছে অনেক। এই ক'দিনেই যেন মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে উঠেছে। চোখদুটো কোটরে।

মধুসূদনের কষ্ট হয়। মায়ের শরীরের এমন হাল হবে সে জানত না।

শিশিরকণা ইসারা করে মধুসূদনকে,—ডাকো।

মধুসূদন মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে ডাকে,—মা। ও মা।

বুড়ীর তন্দ্রার ঘোরে উ-আ—শব্দ করে।

আবার ডাকে মধুসূদন,—মা ওঠো।

বুড়ী চোখ মেলে।

স্বপ্ন দেখছে না ত'। মধু আবার আসবে এ যে বুড়ীর স্বপ্নেরও বাইরে। হতাশায় আর ক্লান্তিতে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিলো বৃদ্ধা। মধু হয়ত আর আসবে না! বুকের শূন্যতার চাপ সহ্য করেও চুপ করে ছিল বুড়ী বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

মনে মনে ভাবত মধু হয়ত বা মরেই গেছে। কিন্তু মুখে বলতো না একটা কথাও। পাছে ছেলেমানুষ বৌ হতাশ হয়ে পড়ে। বরং বলতো মাঝে মাঝে, আসবে বৌমা। ও ফিরে আসবে। যাবে কোথা?

নিজের রক্ত শুকোত চিন্তায়—একান্ত গোপন চিন্তায়।

কাউকে প্রকাশ কোরত না সে কথা।

মধু ডাকে,—মা। ওঠো।

বুড়ী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। স্বপ্নও যদি হয়, তবু এ স্বপ্ন যেন আর না ভাঙ্গে।

মধু প্রণাম করে।

বুড়ীর সম্বিত ফিরে আসে এতক্ষণে। জড়িয়ে ধরে ছেলেকে।

শিশিরকণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মা ছেলের এ দৃশ্য হয়ত সে সহ্য করতে পারবে না।

বালতী দুটো হাতে নিয়ে কলতলায় নেমে যায় ও।

জল তুলে স্নান সেরে ওপরে উঠবে।

মধুসূদন মাকে সান্তনা দেয়—কেঁদো না মা। আমি কি আর একেবারে চলে যেতে পারি!

বুড়ী কাঁদে,—তবে কেন চলে গেলি বাবা। আমার ওপর রাগ করে কি যেতে হয় এমন করে।

মধুসূদন এবার উত্তর দেয় না। সে যে রাগ করেই গিয়েছিলো এ কথা ত' মিথ্যে নয়।

জামা ছেড়ে বসে মধুসূদন।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—কাশীতে,—মায়ের কাছে মিছে কথা বলতে পারে না মধু।

—কেন বাবা। কাশীতে কেন?

—পিসীমার কাছে।

শিশিরকণা তাড়াতাড়ি নীচের কাজ সেরে ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। ঘরের সামনে এসেই ওদের কথা শুনতে পেয়ে ভেতরে ঢোকে

না। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতে।

বুড়ী শুধোয়,—নির্মলার কাছে গিয়েছিলি? নির্মলা কেমন আছে?

—ভালোই। একখানা ঘর ভাড়া করে আছে। দাদা টাকা পাঠায়, পূজো আর্চা করে খায়দায় থাকে। বেশ আছে।

বুড়ী বলে,—তাই নাকি? একবার যেতে ইচ্ছে হয় কাশীতে। কতকাল বিশ্বনাথ দর্শন হয়নি।

—যাবে?

—কি করে যাব ধন বল?

কেন যাও না। ওখানে পিসীমার কাছে থাকবে। মাসে তিরিশ টাকা করে পাঠাব আমি।

বুড়ী চুপ করে থাকে। মধুসূদনের কথার ঝোঁকে ওর মনের ইচ্ছেটা যেন টের পায়।

মধুসূদন বলে,—কই কথা বলচ না যে!

বুড়ীর গলাটা কাঁপে,—তুই বুঝি নির্মলার কাছে এই জন্যেই গিয়েছিলি?

মধুসূদন ধরা পড়ে চুপ করে থাকে।

বুড়ীর চোখদুটো সাদা তালশাঁসের মত নিষ্প্রাণ।

মধুসূদন বলে আর একবার,—তোমার অসুবিধে কিছু হবে না। টাকা পাঠাব। বিশ্বনাথ দর্শন করবে!

আবার একটু চুপ করে বলে,—অসুখ বিসুখ করলেন খবর দিলেই যাব। তাছাড়া পিসীমা তোমার সেবার ভার নিয়েছে। পিসীমা মানুষ ত' খারাপ নয়।

বুড়ী একটা নিশ্বাস ফেলে,—না, তা' নয়।

মধু বলে,—যদি যাও তবে দু'তিন দিনের ভেতরই চলে যা।

—কোথায় ? বুড়ী যেন চমকে ওঠে।

—মধু মিষ্টি হেসে যেন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—ভয় নেই। একা যাব না। এ বাসা তুলে দোব। তোমায় কাশীতে রেখে ব্যবস্থা করে তোমার বউকে নিয়ে জব্বলপুর চলে যাব।

আবার বলে,—মানে, তোমার বউ একা একা আর কার কাছে থাকবে।

—তা ত' বটেই।

শিশিরকণা দোরের পাশ থেকে সব শোনে। মুখটা ওর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। নোতুন বাসায় যাবে শিশিরকণা। জব্বলপুর—মার্বেল পাহাড়—নর্মদার তীরে ছোট একখানি ঘর। কল্পনার সে ঘরে স্বর্গ রচনা করে শিশিরকণা। বিয়ের পর থেকে কত বছর ধরে ত' এই কল্পনাই সে করেছে রাতের পর রাত। স্বামীকে নিয়ে ছোট একটি ঘরে সংসার পাতা। শুধু দুটি মানুষ। না হয় বড় জোর আর একটি বাচ্চা।

মনে মনেই মধুর লজ্জায় রোমাঞ্চিত হয় শিশিরকণা। এ সাধ কি শীঘ্রই ফলবে! মধুসূদন মায়ের মুখের ওপর একটা কথা বলতে পারত না এতকাল। আজ কেমন তর তর করে কথা বলে চলেছে। সবই ত' দেখেছে নিজে চোখে। কতদিন আর মানুষ অন্ধ থাকে!

তবু যেন বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে আজ বড় মায়া লাগে ওর। বুড়ী একা একা থাকবে কাশীতে। কাকেই বা দুটো কথা বলবে। কাকেই বা বকবে, কাকেই বা ভালবাসবে। ইদানীং যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে বুড়ী। কই আর ত' তার সঙ্গে তেমন করে ঝগড়া করে না। বুড়ী না হয় তাদের সঙ্গে রইলই জব্বলপুরে। কদিনই বা বাঁচবে!

মধুসূদন বলে,—তবে ও কথা ঠিক রইল মা।

—তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর বাবা!—আমি আর বেশীদিন বাঁচব না।

—সেই জন্যেই ত' বলছি। শেষ সময়টা বরং কাশীতেই থাকো। মুক্তি হবে।

বুড়ীর চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে, ছেলের হাত দুটো ধরে বলে,—তাই থাকব। তোর যদি ভাল হয় এতে আমি তাই থাকব।

বলে একটু থেমে,—মাঝে মাঝে একটু দেখা দিস বাবা! তোর মুখখানা না দেখলে বেশীদিন থাকতে পারি না।

টস্ টস্ করে জল পড়ে বুড়ীর গাল বেয়ে।

মধু মুখ নীচু করে বলে,—যাব মা। যখনই চিঠি দেবে, তখনই যাব।

—আর বেশী দিন বাঁচব না।—বুড়ীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে অনবরত।

শিশিরকণার মনটা টন্ টন্ করে। আহা রে! বুড়ো মানুষ। ছেলেবউ ছেড়ে কি করে থাকবে এ বয়সে!

অমন কড়া করে বলবার কি দরকার ছিল। যেন তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচে মাকে। হাজার হোক এই মা-ই ত' মানুষ করে এত বড়টা করে তুলেছে।

এ ওনারবড় অন্যায়। মা যাই করুক না কেন, অমন করে মাকে বলতে আছে।

সমবেদনায় গলে পড়ে শিশিকণার মন।

মানুষটা ত' আর খারাপ না। রাগ হলে না হয় একটু গালাগাল করে। সে অমনধারা অনেকেই করে থাকে। তাই বলে বুড়ো মানুষকে বেড়াল পার করে বউ নিয়ে থাকা! লোকে ধম্মে কি বলবে!

শিশিরকণার ভারী রাগ হয় মধুসূদনের ওপর।

আসতে না আসতেই মাকে অমন করে বলবার কি দরকার ছিল। মা ত' আর তেমন নেই। তেমন থাকলে কি যেতে রাজী হোত! কত নরম হয়ে গেছে, কত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ছেলের ভয়ে ছেলে যা বলে তাতেই রাজী।

মধুসূদন বলে,—তবে দিন তিনেক বাদেই যাব আমরা।

বুড়ীর কণ্ঠে অনুনয়,—এ সপ্তাহটা বরং থাক না। তোকে একটু ভাল করে দেখি। আবার কতদিন দেখতে পাব না।

মধুসূদন কঠিন কণ্ঠে বলে,—না, মা আর দেরী নয়।

বুড়ী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বাড়ায় না। বাইরের উদ্দেশ্যে বলে,—বউ মা কই গো। মধুকে গামছা দাও। জলখাবার কিছু দাও।

খাবারের কথা বলতেই মধু মনে হয় টাকা ত' নেই এদের কাছে।

পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে মায়ের দিকে বাড়ায়,—এই নাও টাকা। ধার-টার যদি করে থাকো শোধ করে দিও।

বুড়ী ম্লান হাসে,—আমায় আর কেন বাবা! বউ মা এলে বউমাকে দিও।

বাইরে থেকে শিশিরকণা পুলকিত হলেও মুখখানা নির্বিকার করে ঘরে ঢোকে।

মধুসূদন টাকাটা এগিয়ে দিয়ে বলে,—টাকা কটা রাখো।

শিশিরকণা সব শুনেও যেন নিতান্ত অবাক হয়ে বলে,—আমায় কেন, মার কাছে দাও।

বুড়ী গালে তখন চোখের জলের লোণা দাগ। বলে,—তুমিই নাও বৌমা। আমার আর কদিন!

আর দ্বিরুক্তি না করে শিশিরকণা হাত বাড়িয়ে টাকা নেয়।

—ধার কর্জ কিছু আছে ?—শুধোয় মধুসূদন।

শিশিরকণা ঘাড় নাড়ে।

—কত ?

শিশিরকণা এ কথার উত্তর দেয় না। গামছা তেল সামনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলে,—একবার বাজার গেলে ভাল হোত।

বুড়ী বলে,—আগে জল খেতে দাও। জিরোক, ঠাণ্ডা হোক।

শিশিরকণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারাটা দিনের ভেতর সবাই জানতে পারে শিশিরকণার স্বামী এসেছে।

ত্বপুরেই সেদিন যায় মালতীর ঘরে। মালতী ঘরে ছিল না, ছিল বাস্থদেব।

আবার বিকেলে যায়।

মালতী তখন ছিল।

শিশিরকণা পান চিবিয়ে ঠোঁট রাঙা করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে,—শুন্থন একবার।

অর্থাৎ বাস্থদেবের সামনে কিছু বলতে যায় না।

বাস্থদেব বুঝে আস্তে আস্তে ওঠে বারান্দায় যায়।

শিশিরকণা আনন্দে প্রায় জড়িয়ে ধরে মালতীকে।

—কি হোল তোমার ? অমন কোরছ কেন ?—অবাক হয়ে শুধোয় মালতী।

সলজ্জ চোখে এক গাল হেসে বলে শিশিরকণা,—ও এসেছে।

—কবে ? তাই এত হাসি !

—আজ সকালে। ভোরে। কাক না ডাকতে।

মালতী ওর আনন্দের বিহ্বলতা লক্ষ্য করে। মনের কোথায় যেন

ওর খচ খচ্ করে বেঁধে। বলে,—আচ্ছা তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, না?

শিশিরকণা ঠোঁট দুটো ফুলোয়,—আনন্দ না ছাই। তিনদিন পরেই ত পগার পার।

—সে আবার কি!

—আর বলবেন না। ঘোড়ায় জীন্ দিয়ে এসেছে। বলে তিনদিন পরে যেতে হবে নোতুন বাসায় জব্বলপুরে।

নোতুন বাসা। ভারী মিষ্টি শোনায় কথাটা।

তীরের মত বিঁধে পড়ে মালতীর মনে। স্বামী, নোতুন বাসা। নোতুন করে ঘর পাতা।

কোথায় যেন একটা অসহায় আক্ষেপ থেকে থেকে ঠেলা দেয়। মালতী হাসে। তবু হাসে, বলে,—বেশ ত' তারপর তোমার শাশুড়ী?

—ওনাকে কাশী পার করবেন ঠিক করেছেন। আমি তা হতে দিচ্ছি না। আচ্ছা দিদি বলুন ত' বুড়ো মানুষ কাশীতে একা একা থাকবে কি করে।

—তাই ত'। সায় দিতে হয় মালতীকে।

শিশিরকণা চোখ ঘোরায়,—ঝগড়া হবে ওর সঙ্গে। হবে। তা বলে অলেয্য কিছু ত' করতে দোব না। কি বলুন দিদি।

—তা ত' বটেই,—শুষ্ক সায় দেয় মালতী।

শিশিরকণা হাত ধরে মালতীর,—আপনার জন্যেই বেঁচেছি দিদি। টাকা ধার দিয়ে যদি না বাঁচাতেন তবে কি যে হোত!

—না, না, এ আর একটা বেশী কি!

—তা যাই বলুন। আপনার জন্যেই আজ সুখের নাগাল পাচ্ছি।

সুখের নাগাল কথাটায় কত বিরাট আশার প্রকাশ। মধুর মনো-লোভ! মালতীর মুখটা ম্লান হয়ে ওঠে।

বলে শিশিরকণা,—টাকা কটা দিতে এলুম।

বলে মালতীর হাতে টাকা গুঁজে দেয়।

মালতী কথা না বলে টাকাটা নেয়। বড় ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। একটু জিরোতে পারলে যেন বাঁচত। শিশিরকণা ছাড়বার পাত্র নয়।

বলে আবার,—ঠিক আছে ত'। গুনে নিন।

—যাক গুনতে হবে না।

—বাব্বা! কি দিনই গেছে। দেখেছেন ত' চোখের ওপর!

—হুঁ।

—এক একটা দিন যেন এক একটা যুগ। গোপনে বলি আপনাকে, বাসায় একবার যাই, তারপর বোঝাব মজাটা। এর শোধ না তুলি ত' আমার নামে কুকুর পুষবেন।

মালতী ঘাড় নাড়ে:

—চিঠি পত্তর দেবেন ত', না ভুলে যাবেন?

ভুলব কেন?

—বলা যায় না। চোখের আড়াল ত' মনের আড়াল। যাবার আগে একবার ইচ্ছে ছিল ভাইয়ের বাড়ী যেতে। তা, ওনার জ্বালায় ত' হবার উপায় নেই। এমন মানুষ! যা বলবে তাই।

—তাই নাকি! —বিরক্ত লাগলেও বলতে হয় মালতীকে।

—সে বুঝি জানেন না। সেবারে পূজোর সময়—।

মালতী থামায়,—যাও এবার। তোমার ওনার বোধ হয় জলখাবার সময় হোল।

—পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। রাত জেগে এসেছে ত' ট্রেনে। উঠলে শাশুড়ীর গলা পাব।

—শাশুড়ী কি করছে?

—বসে বসে ছেলেকে বাতাস করছে। ছেলে বলতে অজ্ঞান। ছেলে যেন আর কারো হয় না।

—তুমি বরং গিয়ে বাতাস করো। বুড়ো মানুষ কষ্ট হচ্ছে।

—দায় পড়েছে আমার, অত ভাববেন না! —বলেই খিল্ খিল্ হাসি শিশিরকণার।

হাসিটা মোটেই ভাল লাগে না মালতীর। চুপ করে থাকে।

বাসুদেব ঘরে ঢোকে এবার।

শিশিরকণা ওঠে,—পালাই দিদি।

চলে যায় শিশিরকণা।

মালতী হাত মুখ ধোয় না, সাড়ী পালটায় না। চুপ করে বসে থাকে।

বাসুদেব ওর মুখের দিকে তাকায়। মুখটা ভার ভার। আবার কিসের মেঘ জমলো মনে?

বাসুদেব শুধু বলে,—সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

মালতী চুপ করে থাকে।

—আলোটা জ্বালতে হয়,—আবার বলে বাসুদেব।

মুখ তোলে মালতী,—ভাল লাগছে না।

বাসুদেব চেয়ারে বসে। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। ঘরটা অন্ধকারে ভরে যায়। ঝিরঝিরে বাতাস ঢোকে ঘরে। আকাশ নীল—পরিষ্কার।

চুপ করে বসে থাকতে ভারী আরাম লাগে।

তবু বলে বাসুদেব,—কি হোল? শরীর খারাপ?

না।

বাসুদেব বোঝে এবার কিছুটা।

চুপ করে থাকে। চুপ করে থাকতে দেয় মালতীকে, সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়। বাসুদেব ঠিক করেছে আর কথা বলবে না। বেশী কথা বলা কোন কালেই ওর স্বভাব নয়।

শেষ পর্যন্ত মালতীকেই বলতে হয় বাসুদেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে,—ভাল লাগে না আর।

—কি ?— নেহাৎই বলতে হয় বাসুদেবকে।

—সবই।— মালতীর কণ্ঠে কাঠিন্যের ঝঙ্কার।

বাসুদেবের পক্ষে এ কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মালতী ওঠে। আলো জ্বালে। কাপড় ছাড়ে। রান্নার যোগাড় করে। বিছানা করে।

একটা কথাও মুখে নেই কারো।

শিশিরকণা রান্না করছিল। ভালো মাছ এনেছে মধুসূদন, নিজে বাজারে গিয়েছিলো। শিশিরকণা একটা টাকা দিয়েছিলো। মধুসূদন বলে,—আরও দুটো টাকা দাও।

—কেন ? এক টাকা বাজারেই হবে।

মধুসূদন হাসে,—হাতে টাকা পড়তে না পড়তেই কিপ্‌টেমী।

—চাই না তোমার টাকা। নাও।

মুখে বললেও টাকা শিশিরকণা দেয় না। আর আট আনা পয়সা দেয়।

মধুসূদনকে তাই নিতে হয়।

রান্না করতে করতে ভাবে শিশিরকণা সংসার কি ভাবে টানাবে। কত করে বাজার করবে কতটা কয়লা লাগবে, কতটা ঘুঁটে। ডাল দরকার হবে না। দুজন মোটে মানুষ। রোজই মাছের ঝোল ভাত। মাছ আবার সে দেশে পাওয়া যায় কিনা জানে।

—অ বৌদি !—ফুলমণি এসে ডাকে।

রাঁধতে রাঁধতেই শিশিরকণা মুখ তোলে।

ফুলমণি সমরেনের সঙ্গে সেই ঘটনার পর আজ প্রথম এলো।

—শুনছি নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। কথাই বোলচ না যে !—ফুলমণি রান্না ঘরেই বসে পড়ে—শুনে আব্দ বলি যাই একবার শুনে আসি। বাড়ী যে কাণা হয়ে যাবে গা !

—কেন তোমরা ত' রইলে !—মুখ টিপে হাসে শিশিরকণা।

ফুলমণিও হাসে,—আমরা আবার একটা মনিষ্যি। কোথা চললে ?

—জব্বলপুর।

—সে আবার কোথা গা !

—অনেক দূর। মানে হাজার হাজার মাইল।—মুখ চোখ ঘুরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে শিশিরকণা।

ফুলমণি বলে—এই মরেচে, তবে ত' আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না !

—না।

—কি রান্না হচ্ছে ! দাদা বুঝি বাজার করলে আজ ?

শিশিরকণা ঘাড় নেড়ে খুন্তি দিয়ে মাছ নাড়ে।

—শাউড়ী থাকবে কোথা !

—কাশী যাবে। সেখানে থাকবে পিসশাশুড়ীর কাছে।

ফুলমণি বলে,—তবে ত' তোমার হাড় জুড়োল। বাবা কি যাতনাই পেয়েছ !

শিশিরকণা শাশুড়ীর নিন্দে সইতে পারে না—হাড় জুড়োবে কেন ভাই। উনি যদি আমাদের সঙ্গে যান ! তবে ত' বুকের ভাগ্যি।

ফুলমণি অবাক হয় একটু, শাশুড়ী নিন্দায় পঞ্চমুখ বৌদির মুখে

এমন কথা আশা করেনি ও। ভেবেছিলো শাশুড়ীর নামে কিছু বললে খুসীই হবে। কাজেই সুর পালটায় ফুলমণি,—তা বটে। বুড়ো মানুষ। একা একা থাকবে!

—তবে বলো দিকি ভাই। উনি কিছুতেই বুঝবেন না!

দাদাকে বলে করে বোঝাও। আচ্ছা চলি ভাই বৌদি আবার আসব।—ফুলমণি চলে যায়।

রাত্রে মধুসূদন মায়ের কাছে শুলেও বুড়ী ঘুমিয়ে পড়বার কিছু পরেই উঠে আসে রান্নাঘরে।

শিশিরকণা ঘুমোচ্ছে। রান্নাঘরের ভেজানো দোর খুলে ভেতরে ঢোকে মধু।

শিশিরকণা শব্দ শুনে টের পায় কে এলো। তবু ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকে।

—শুনছ!—গা ধরে নাড়া দেয় মধুসূদন।

শিশিরকণা ঘুমের ভাণে নীরব।

আরও জোরে ধাক্কা দেয়।—কই গো!

—কে?—এতক্ষণে সাড়া দেয়,—শিশিরকণা।

মধুসূদন ওর হাতটা ধরতেই ছাড়িয়ে নেয় ও,—ছাড়ো!

ঝাম্‌টা খেয়ে মধু একটু অবাক হয়।—কি হোল?

শিশিরকণা উত্তর দেয় না।

—কি হোল গো! রাগ হোল কেন?

—রাগ আবার কার ওপর হবে! রাগ করবার মত সংসারে মানুষ কই!—বলে শিশিরকণা—রাগতঃ স্বরে।

মধুসূদন বলে,—রাগ অবশ্য হবারই কথা। তবু কেন যে গিয়েছিলাম তা ত' জানো না!

—জানবার দরকার নেই।

—বেশ চললুম।—বলে পাল্টা রাগ করে ওঠে মধুসূদন। উঠতে গিয়ে টের পায় ওর কাপড়ের খুঁটে ধরা আছে। আবার বসে,—কথা শুনবে না, মিছি মিছি রাগ করবে!

—না রাগ করবে না। সোমত্ত বউ বুড়ো মাকে ফেলে যে পালিয়ে যায় তারওপর রাগ করবে না ত' কি করবে? একটু ভাবলেও না।

মধু গম্ভীর স্বরে বলে,—সবই জানি। তবু বউ মায়ের জ্বালায় নিজে মরে যাওয়ার চেয়ে একটা ব্যবস্থা করা ত' ভালো।

—ভারী ব্যবস্থা করেছে?

—কি ব্যবস্থা করেছি শুনেছ?

—সব শুনেছি সকালে।

—তুমি কি আড়ি পেতে ছিলে নাকি!—হেসে ফেলে মধুসূদন।

শিশিরকণা একটু লজ্জা পায়।

মধুসূদন বলে,—সবই ত' শুনেছ। এই ব্যবস্থা করতেই গিয়েছিলাম। ভেবে দেখলাম এ ছাড়া আর অন্য পথ আমার নেই।

—খুব আছে।

—কি শুনি?

শিশিরকণা ফিস্ ফিস্ আওয়াজ কডা শোনায়,—বুড়ো মাকে ফেলে আমায় নিয়ে ঘর করতে লজ্জা করবে না তোমার?

স্পষ্ট উত্তর দেয় মধুসূদন,—না।

—তোমার না করে, আমার লজ্জা করবে।

—তবে তুমি যেও না। স্পষ্ট করে বলো। আমি কালই আবার চলে যাই।

—বাঃ! অমনি রাগ! আমি কি রাগের কথা বলেছি। আমি

বলছি ভেবে দেখো।

মধুসূদন গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—তোমার চেয়ে অনেক বেশী আমি ভেবেছি। এ ছাড়া উপায় নেই।

—কিন্তু মার মনে যে কষ্ট হবে!

—হবে। হলে আর কি করা যাবে!

—তবে যা ভাল বোঝ তাই করো।—হাল ছেড়ে দেয় শিশিরকণা।

মধুসূদন বলে,—আচ্ছা, তোমরা কি ভাবলে? আর আসবো না?

মধুসূদনের হাতখানা কাছে টেনে নেয় শিশিরকণা। কোন কথা বলে না।

মধুসূদনও কথা বলে না আর।

ফুলমণির খুব আনন্দ। শিশিরকণা জন্মের মত চলে যাবে, এতদিনে যদি সমরেন তার দিকে ফেরে। আপদ বিদায় হোল এত কালে। ভগবান বোধহয় মুখ তুলে চাইলে। সমরেন রাত্তিরে ফিরতেই বলে ফুলমণি,—শুনেছ, বৌদিরা চলে যাচ্ছে।

সমরেন জামা খুলতে খুলতে বলে,—কে বৌদি?

—ওই যে গো ও ঘরের বৌ—তোমাকে হেনস্তা করলে সেদিন।

সমরেন জামাটা খুলে কৌতূহলে তাকায়,—কোথা যাচ্ছে?

—কোথায় সে হাজার মাইল দূরে, জন্মের মতো।

সমরেনের মুখটা শুকিয়ে যায়!

ফুলমণি হাসতে হাসতে বলে,—ওর বর এসেছে আজ সকালে নিয়ে যাবে।

খুব হাসে ফুলমণি।

সমরেন স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

ফুলমণি আরও হাসে সমরেনের ভাবগতিক দেখে, বলে,—খুব বোধহয় লেগেচে তোমার ?

ধমকে ওঠে সমরেন,—হাসিস নি দাঁত বার করে।

ফুলমণিও চটে,—হাসব না ত' কি কাঁদব শুনি। মুখপুড়ী যাচ্ছে ত' যাক না।

—মুখ খারাপ করবিনি,—চোখ লাল করে সমরেন।

ফুলমণিও রাগে ফোলে,—অ! কি দর দরে! একেবারে কেঁদে উঠছে। কার ওপর অত তম্বি কোরচ শুনি।

সমরেন হাত মুঠো পাকিয়ে বলে,—ফের মুখে মুখে কথা। দাঁত ভেঙ্গে দোব।

ফুলমণি এবার স্তম্ভিত হয় কিছুক্ষণ সমরেনের উত্তেজনায়।

তারপর ফেটে পড়ে,—কি দাঁত! ভাঙবে! এত বড় আস্পদ্দা! শেষ কালে মারবে আমায়।

ধীরেনবাবু এসে পড়ে,—কে মারবে রে কি হয়েচে।

ফুলমণি কেঁদে ওঠে,—ওই যে তোমার গুণধর ভাই। বলে মেরে আমায় দাঁত ভেঙে দোব! আমার কেউ নেই, তাই মার খেয়েও আমার থাকতে হবে ভেবেচে!

ধীরেনবাবু সমস্ত দিনের হাড় ভাঙা খাটুনীতে তেতে ছিলো, তারওপর ফুলমণির অপমানে আগুন হয়ে ওঠে,—বেরো হারামজাদা বাড়ী থেকে। বেরো।

সমরেনও আগুন,—বেরোব না! এ কি তোমার বাড়ী ?

—না, তোর বাবার বাড়ী!—ধীরেনবাবু খিঁচিয়ে ওঠে, মেরে বার কোরব তোকে।

ভাড়াটেরা দু' একজন উঁকি মারে।

সমরেন গুম্ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

ফুলমণিকে নিয়ে ধীরেনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—বোধহয় বারান্দায়।

ফুলমণির পিঠে হাত বোলায় ধীরেনবাবু। সান্ত্বনা দেয়। ফুলমণি কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সমরেন বসে থাকে—অনেকক্ষণ।

একটা নিশ্বাস ফেলে ওঠে! জামাটা পরে আবার।

ঘর থেকে বেরোয়।

বারান্দায় ধীরেনবাবু ফুলমণি একে যেতে দেখে ঘরে ঢোকে।

সমরেন বারান্দায় দাঁড়ায়।

বারান্দার একেবারে ওপাশে রান্নাঘরে শিশিরকণা। ঘরে ওদের আলো নেই। বুড়ী বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

মধুসূদন বাজার গেছে হয়ত।

সমরেন এগোয়!

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায়। শিশিরকণা রান্না ঘর থেকে বেরোবার মুখে ডাকে সমরেন,—বৌদি?

শিশিরকণা তাকায় ওর দিকে।

আজ আর ছেলেটাকে দেখে রাগ হয় না ওর।

খুব মিষ্টি স্বরে বলে,—কি ভাই?

—আপনি বুঝি চল্লে যাবেন—খুব আস্তে শুধোয় সমরেন।

শিশিরকণা ওর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে একটু,—হ্যাঁ, পরশু চলে যাব।

সমরেন মুখটা নীচু করে বলে,—আমায় মাপ করবেন বৌদি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি।

গলাটা কাঁপে সমরেনের।

শিশিরকণার বুকটা ভরে ওঠে সমবেদনায়,—তুমি ত' কোন অন্যায় করোনি। করে থাকলেও ছোট ভাইয়ের অন্যায় কি কেউ ধরে।

সমরেন হঠাৎ নীচু হয়ে শিশিরকণার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

শিশিরকণার মাথাটা স্নেহে ভরে ওঠে। আজ প্রথম ওর মনে হয় সমরেন বড় ভালো। ও সেদিন কি ভালই করেছিলো, অকারণে মানুষকে সন্দেহ করবার মত পাপ যখন মনে আসে, তখন মন যে মানুষের কি নীচুই হয়ে যায়! নিজের কাছে নিজে লজ্জা পায় শিশিরকণা।

সমরেন বলে,—আমিও চলে যাচ্ছি বৌদি। আর দেখা হবে না।

ওর চোখ দুটো চক্ চক্ করে।

শিশিরকণা মধুময় হয়ে ওঠে ওর ওপর স্নেহে,—কেন, ভাই কোথা যাবে?

সমরেন কথা বলে না।

শিশিরকণা নিজের ঘরের দিকে তাকায়। চার পাশে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। বলে,—একটা কথা বোলব যদি কিছু মনে না করো।

—বলুন।

একটা ঢোঁক গিলে বলে শিশিরকণা,—ফুলমণির সঙ্গে তোমার ঝগড়া আমি মাঝে মাঝেই শুনি, আজও শুনেছি। ওর ওপর রাগ করে চলে যেও না।

সমরেন নীরব।

শিশিরকণাই বলতে থাকে,—দেখতে শুনতে সব দিকেই ভালো হয় ওকে যদি বিয়ে করো। সমরেন চমকে ওঠে। শিশিরকণার সঙ্গে সে ত'

কখনও কথাও বলেনি। আজ কয়েক মিনিটের আলাপে সে এত অন্তরংগ হয়ে উঠলো কি করে? সমরেন জানত না যে মেয়েদের স্নেহের দুয়ারে ঠিক মত ঘা দিতে পারলে মন খুলে দেয়। সমবেদনার জলবেগকে চাপতে পারা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শিশিরকণা জানে সে চলেই যাবে। আরও জানে, মন দিয়ে জেনেছে সমরেন তার কাছে অতি দুর্বল শিশুর মত। তাই মুহূর্তে তার কাছে অন্তরংগ হয়ে উঠতে দ্বিধা সে করেনি। যতদিন সমরেনের দুর্বলতায় কামাবেগের আভাস ছিল, ততদিন সে ভয়ে ভয়ে ওকে এড়িয়ে চলেছে। শিশিরকণা সমরেনের মনের ভাবগুলোকে আয়নার মত দেখতে পায়। আজ ও দেখতে পেয়েছে সমরেনের দুর্বলতা এক অসহায় শিশুর মত। কামাবেগের স্তর পেরিয়ে সমরেনের ভাব এখন শ্রদ্ধার রূপ নিয়েছে। তাই শিশিরকণার এই অন্তরংগ দ্বিধাহীন আলাপ।

সমরেন কিছুক্ষণ চুপ করে বলে,—না। সে হয় না।

শিশিরকণা তাকায় সমরেনের দিকে।

চোখের ভাষা বলে, আমি বললেও হয় না।

সমরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিশিরকণা আর দাঁড়ায় না। ঘরে চলে যায়।

সমরেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। রান্নাঘরের দিক থেকে সরে আসে। আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র ভরা আকাশ। আকাশ ছায়ায় ছায়ায় ভাব আসে মনের ওপর। মনের অনেক পর্দা উঠে যায় যেন আজ। সমরেন কোন কিছু না ভেবেও চুপ করে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সময় কাটে। অনেক সময়।

রাত বাড়ে।

সমরেন দাঁড়িয়েই থাকে।

কোন কিছু একটা করবার আশা আসক্তি যেন নেই আর। যা হয় হোক। ওই আকাশের নক্ষত্র যেমন আপন নিয়মে চলেছে নিরাসক্ত পদক্ষেপে। তেমনি চলুক সমরেনের জীবন অবধারিত অজ্ঞাত নিয়মে।

ও দাঁড়িয়ে থাকে। চেতনায় ওর সব ভাবটুকু ধরা পড়ে না। তবু আবছা আবছা আসে ভাবগুলো মনের অবচেতনায়।

—পিঠে একটা হাতের স্পর্শে ফিরে তাকায় সমরেন।

ফুলমণি এসেছে।

—চলো ভেতরে। ডাকে ফুলমণি।

সমরেন তাকায় ওর দিকে। এত অপমানের পরও আবার ডাকতে এসেছে তাকে। গালে তখনও চোখের জলের দাগ ধুয়ে যায় নি।

ফুলমণিকে আজ একেবারে নোতুন মনে হয় সমরেনের। বোকা মেয়েটার নীরেট মনেও প্রেম মধুর হয়ে দেখা দিয়েছে। কত মিষ্টি করে তুলেছে ওকে।

সমরেন মূর্খ বোকা, তবু আজ শিশিরকণা ওর চোখ খুলে দিয়েছে যেন। ফুলমণির কাঁধ দুটো চেপে ধরে সমরেন।

ফুলমণি ভয় পায়, ভীত স্বরে বলে —রাগ কোরনা। অন্যায় হয়েছে আমার।

সমরেন আস্তে বলে,— অন্যায় আমার। তোর নয়।

একটু থেমে বলে,—তোকে যদি বিয়ে করি, সুখী হবি?

ফুলমণি মুখটা নীচু করে।

অনেক্ষণ কাটে। মুখ আর তোলে না।

সমরেন জোর করে ওর মুখ তুলে দেখে ফুলমণি কাঁদছে।

—কিছু বল্। কথা বল্।

ফুলমণি কি বলবে ? কেঁদেই আকুল ও।

বোঝে সমরেন।

একবার বলে,—কাঁদিসনে ফুলমণি।

তবু ফুলমণির চোখের জল থামে না।

সমরেন বলে,—আগে ত' কখনও আমায় বলিসনি। কেন ?

ফুলমণি জবাব দেবে কি। ওর গলা রুদ্ধ অশ্রু আবেগে।

রাত বাড়ে আরও রাত বাড়ে।

সমরেন দাঁড়িয়েই থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

ফুলমণিই একসময় বলে,—চলো, খাবে চলো।

—চল।—বলে সমরেন ওর সংগে রান্নাঘরে যায়।

ধীরেনবাবুকেও ডেকে খেতে দেয় ফুলমণি। নেশার ঘোরে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলো লোকটা।

খেতে বসে ওরা।

সমরেনকেই সবশেষে ওদের নিজেদের বিয়ের কথা বলতে হয়। বলবার ত' আর দ্বিতীয় মানুষ নেই।

ও বলে,—ফুলমণির যে এক দূর সম্পর্কের দাদা ছিল সে কোথায় বলতে পারো ?

ধীরেনবাবু হঠাৎ এ প্রশ্নে একটু বিস্মিত হলেও বলে,—না! বহুকাল তার খোঁজ নেই।

সমরেন বলে,—তবে ত' মুস্কিল হোল।

—কেন ?

—ফুলমণির বিয়ের কথা কাকে বলা যায়।

ধীরেনবাবু একটু থেমে বলে,—বিয়ে বললেই ত' বিয়ে হয় না। টাকাই বা কই, পাত্রই বা কই ?

সমরেন ধীর কণ্ঠে বলে,—টাকা লাগবে না। পাত্র আছে।

ধীরেনবাবু মুখ তোলে,—কে ?

—ধরো না আমিই যদি—।

—তুই !—ধীরেনবাবুর নেশার ঝোঁক কেটে যায়।

ফুলমণি তরকারীটা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এ আলোচনায় থাকতে ওর বড়ই লজ্জা হয়।

ধীরেনবাবু আবার বলে,—তুই বিয়ে করবি ?

—হ্যাঁ।

—ফুলমণির আপত্তি নেই ?

সমরেন খেতে খেতে বলে,—না। ও সুখীই হবে।

ধীরেনবাবুর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়,—সুখী হবে !

সমরেন আরও বলে,—বিয়ের পর আর এ বাড়ীতে থাকতে চাইনা। আলাদা বাসা কোরব।

—আলাদা বাসা !—

কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ধীরেনবাবু। বিশুদ্ধ কোটরাগত চোখের চাউনী যেন আরও নীরস নিষ্প্রাণ মনে হয়। মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে ক্রমে।

ফুলমণি ঘরে ঢোকে। ফুলমণির দিকে তাকায় ধীরেনবাবু।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ফুলমণির বুকটা কেমন করে ওঠে। ধীরেনবাবু বেদনা ফুলমণির অজানা নেই।

বুড়ো মানুষ। আহা, বেচারীকে একা একা থাকতে হবে। হোটেলে খেতে হবে, আর ফুলমণির স্বপ্ন তার গভীর বেদনার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে শেষ জীবনে।

ধীরেনবাবু ভাইয়ের দিকে তাকায়। ফুলমণির দিকে আর

একবার তাকায়।

তারপর একটু ম্লান হেসে বলে,—বেশ ত'। আনন্দের কথা!

উঠে পড়ে ধীরেনবাবু। বোধহয় আঘাতটা সামলাতে। ওর তাল-শাঁসের মতো সাদা চোখদুটো যে জোলো হয়ে উঠেছিল সেটা লক্ষ্য করেনি ফুলমণি বা সমরেন।

অনেক চেষ্টার পর একটা চাকরী জোটাতে পেরেছে নুপুর।

মাইনেটা রবীনের চেয়ে বেশী। কলকাতার বাইরের এক গার্লস স্কুলের মাস্টারী। স্কুলের সম্পাদক তাকে একটি বাসাও দেবে বলেছে, ভাড়া লাগবে না কিছু। নুপুর সেখানেই চলে যাবে স্থির করেছো। মাকে বলেছিলো। মা রাজী হয়েছে, বাবা রাজী হওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারেন।

কাজ করবার শক্তি আর তাঁর নেই। ঝুমুর ত' সংগে যাবেই। দাদার যাওয়া হবে না। চাকরীর জন্যে ওকে কলকাতায় থাকতে হবে। সস্তা কোন মেসে অথবা হোটেলে থাকবে সে। মাসে মাসে কিছু টাকাও পাঠাবে বলেছে। না পাঠালেও চারটে মানুষের খাওয়া জোটাতে পারবে নুপুর। না হয় দুটো মেয়েকে বাড়ীতে গিয়ে পড়াবে। কোন মতে চলে যাবে।

তাছাড়া বাইরে যেতেই চায় নুপুর। কলকাতায় থাকলে কোন সময় হয়ত বা সুবীরের সংগে দেখা হয়ে যেতে পারে! সেটা সইতে পারবে না নুপুর। ওর সংগে দেখা হবার কথা ভাবলেই নুপুরের বুক কাঁপে, মাথার ভেতর কেমন করে। সুবীরের সমস্ত স্মৃতি ও জীবন থেকে ধুয়ে ফেলতে চায়। ও জানে ধুয়ে ফেলবার কথা ভাবলেই ধুয়ে যায় না। তবু কোনদিন দেখা না হলে, তার কথা না ভাবলে, নানা কাজে

নিজেকে ডুবিয়ে দিলে ক্রমশঃ ভুল হয়ে যাবে সব। দৈনন্দিন জীবনে তার কথা আর মনে থাকবে না। তাছাড়া ওটা জীবনের একটা বোকামী বলেই ভেবে নিয়েছে এখন নুপুর। প্রেমের দান জীবনের গভীরতা দিয়ে অনুভব করতে না পারলে তা' স্থায়ী হয় না কখনও। নুপুর জানে, ও নিজেও সুবীরের প্রেম আত্মস্থ হয়ে অনুভব করবার অবকাশ পায়নি। সুবীরের বাইয়ের জীবনের রঙ বাহার ওর মনে এক নেশা ধরিয়েছিলো মাত্র। তাই ভাল লাগত। যেমন ভাল লাগে মানুষের নেশা করতে সুবীরের হয়ত বা সে নেশাটুকুও ছিলো না, ছিলো কামার্ত অভিনয়। জুয়া খেলবার অত্যুগ্র কামনা। ওটা আরও নীচ। ঘৃণায় রিরিয়ে ওঠে নুপুরের মন।

চলে যাবে নুপুর। কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। একেবারে চিরদিনের মত। জীবনের গভীরতায় ডুবে যাবে। ডুবে যাবে নানা মানুষের ভালবাসায় তাদের সুখে দুঃখে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের পাতায় পাতায় স্বাক্ষর থাকবে তার নাম। এই শ্রেয়। প্রেয় হয়ত বা নয়। প্রেয় যা, তা' হয়ত জানবার অবকাশও মিলবে নির্জন পরিবেশে। নিজেকে দেখবার, ভাল করে চেনবার সুযোগ পাবে খোলা মাঠে, আকাশের বিশাল নীরবতায়।

নুপুরকে যেতেই হবে। ঘরে মাদুরে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ভাবছিলো নুপুর। হঠাৎ ঝুমুরের ফিস্ ফিস্ কথা কানে আসতে ও চোখ মেলে। দেখে ঘরে ঝুমুর নেই। একটু আগেও ঝুমুর ওর পাশে শুয়েছিলো, ওঠে নুপুর। ও ঘরে মা ঘুমুচ্ছে। বাবাও।

নুপুর বারান্দার একটু আড়ালে দাঁড়ায়।

ঝুমুর বলছে ফিস্ ফিস্ করে,—চলে যাব এখান থেকে।

ছেলেটাকে দেখতে পায় নুপুর। বিমল! বিমল শুধোয়,—কবে?

—আর দেরী নেই বেশী। দিন দশ বারো।

বিমলের চিন্তিত স্বর শোনা যায়,—কি করা যায় তবে?

—আমি জানি না।

—তুমি একটা কাজ করতে পারবে না?

—কি?

—তোমার মাকে বলতে পারবে না বিয়ের কথা?

—আমার ভয় করে।

—ভয় কি? তুমি ত' চুরি ডাকাতি কোরছ না।

—না, ভয় করে আমার।

তবে আমাকেই বলতে হবে।

—না, না, সে আমার বড় ইয়ে হবে। আমি মুখ দেখতে পারব না।

বিমলের গম্ভীর স্বর শোনা যায়,—পাগলামী কোর না। একটা কিছু করতে হবে ত'?

—যা হয় করো।

—বেশ যদি কাউকে বলতে না চাও। তবে চলো। আমার সঙ্গে আজ রাত্রেই চলো আমাদের বাড়ী।

—ওরে বাবা। যদি ওরা জানতে পারে।

—জানলে ত' বয়ে গেল। তোমাকে ত' মুখ আর দেখাতে হবে না।

—যদি বেরোবার সময় টের পায়।

—দুর! পাগল নাকি। রাত্তিরে সবই ঘুমোলে বেরিয়ে আসবে, আমি বাইরে থাকব।

—তারপর?

—তারপর আমাদের বাড়ী যাবে।

—তারপর ?

—তারপর বিয়ে হবে।

—তোমার মা যদি কিছু বলে ?

—সে ভাবনা আমার। তোমার নয়। আমার মাকে ত' দেখোনি। মা সব জানে। তোমাকে বাড়ী নিয়ে গিয়েও যদি বিয়ে করি, তিনি খুসীই হবেন।

—কি বলবেন ?

—বলবেন বেশ করেছিস। মেয়েটার জীবন নষ্ট হতে দোব না।

—জীবন নষ্ট বুঝি আমার একার ?

—আমার দিকটা মা অতটা জানে না। তোমার ওপরই সব দোষ চাপিয়েছি কিনা। বলেছি, সে মেয়েটি আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। ধনুক ভাঙা পণ। আমি নাকি খুব সুন্দর, আমি নাকি ভাল। ব্যস্! মা গলে গেল। বললেন,—তা তুই সুন্দর বই কি বাছা! মেয়েটিত' ঠিকই বলেছে। তোর বন্ধুকে দিয়ে বিয়ের কথা পাড় না।

ঝুমুরের চাপা হাসির শব্দ শোনা যায়। বলে,—বলো না দাদাকে ?

—তোমার দাদার ত' পাত্তাই পাই না। দেখা হয় না। সে কোথায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে। তাছাড়া আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকে। তোমাদের বাড়ীতে তুমি বলো।

—বলতে যে পারিনে তা নয়। মাকে বলা যায়। যদি মা রাজী না হয়। যা নয় তাই বলে। তোমাকে অপমান করে ?

—করে ত' করবে। মারবে না ত' ?

—তবে ভরসা করে বোলব ?

—নিশ্চয়ই। বেশী কিছু বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদের বাড়ী।

—দেখি তবে আজ রাত্তিরে যদি বলা যায়। দিদি থাকলে বড় লজ্জা করে।

—দিদির আড়ালেই বলবে।

—তবে কাল একবার এসো। দুপুরে।

—দুপুরে অপিস পালান আর কতদিন চলবে?

—আর দু' একটা দিন।

—আজ তাহলে যাই, কেউ আবার এসে পড়বে।

বিমল চলে যায়। ঝুমুরের পিছন দিকে একবার তাকায়।

নুপুর বারান্দার পাশ থেকে সরে যায়।

ঝুমুর পা টিপে টিপে ঘরে আসে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু চমকে ওঠে।

নুপুর চুপ করে বসে আছে। মুখখানা ওর অস্বাভাবিক গম্ভীর।

একটু হাসবার চেষ্টা করে ঝুমুর। গলাটা ওর কাঁপে বলতে,—কখন ঘুম ভাঙলরে দিদি?

নুপুর ও কথার উত্তর দেয় না।

শুধু বলে,—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলে উঠে গিয়ে ঘরের দোরটা বন্ধ করে দেয়।

ঝুমুরের মুখ শুকিয়ে যায়। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। দিদি নিশ্চয়ই সব শুনেছে। কি হবে এবার। ঝুমুর কি করবে? এখুনি পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচত ঝুমুর।

নুপুর দোর বন্ধ করে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

শুধোয়.—ও ছেলেটি কে?

ঝুমুর নিরুত্তর। কথা বলবে কি। ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে।

—কে ও ছেলেটি?

আর উপায় নেই। সব বলতেই হবে। মনে অনেক চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে বলে ঝুমুর,—ওর নাম বিমল!

—ওর সঙ্গে কতদিন থেকে তোমার আলাপ?

—অনেক দিন থেকে।

নুপুর ওর স্পষ্ট জবাবে একটু বিস্মিত হয়,—ও কি দাদার বন্ধু?

—হ্যাঁ।

নুপুরের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। ঝুমুরের জীবন সে নষ্ট হতে দিতে পারে না। বড় বোন হয়ে তার কর্তব্য ঝুমুরকে সাবধান করে দেয়া। ঝুমুরকে আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচান। নুপুর এ সব ছেলের কথাকে বিশ্বাস করে না। এদের মুখের কথার ভালবাসাকে ঠাট্টা বলে মনে করতে তার একটুও বাধে না আর। সেও ভুলেছিলো এমনি এক ছেলের মিষ্টি কথায়। সে ভুলের জের টানতে হবে তাকে সমস্ত জীবন। বোনকে সেই একই ভুল করতে সে দেবে না। কিছুতেই না।

ও কঠিন স্বরে বলে,—এই বাজে ছেলের সঙ্গে মিশতে তোমার লজ্জা করে না।

ঝুমুর চুপ করে থাকে। মুখটা নীচু করেই থাকে।

—তুমি হয়ত জানো না, আমি জানি। এরা মেয়েদের জীবন নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। কর্তব্যের বোঝা ঘাড়ে চাপবার আগে সরে দাঁড়াবে তোমাকে পথে বসিয়ে। আজ মিষ্টি কথা বলবে। কাল তোমাকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বার করে দেবে। জানোয়ার এরা। অপদার্থ। পাষাণ।

ঝুমুর আর সইতে পারে না।

বলে ওঠে,—চুপ করো দিদি।

ওর স্বরে টের পায় নুপুর ঝুমুর কাঁদছে।

নুপুর এগিয়ে এসে ঝুমুরের মুখটা তুলে ধরে। চোখের জলে ওর গাল ভিজে গেছে। ঠোঁট দুটো তখনও কাঁপছে থর থর করে।

ঝুমুর জানে দিদির কোথায় বেদনা। ঝুমুর লক্ষ্য করেছে দিদির ভাবান্তর, দিদির মনের এক বিরাট ক্ষত চাপবার আপ্রাণ প্রয়াস।

নুপুর ঝুমুরকে কাঁদতে দেখে আরও এগিয়ে আসে।

ওকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে।

ঝুমুরের বুক ভেঙে যায়।

দিদির কাঁধে মাথা রেখে অজস্র কাঁদে ও।

নুপুরের গলাটা যেন অকস্মাৎ নরম হয়ে আসে, ভিজে ওঠে গলার স্বর,—না বুঝে হয়ত কিছু বলেছি। আমায় ক্ষমা কর ঝুমুর।

নুপুরের চোখ আর্দ্র হয়ে আসে।

ওর গলা কাঁপে,—আমি ঠকেছি ঝুমুর। আমি নিজে নষ্ট হয়ে গেছি। তুই আর নিজেকে নষ্ট করিসনে ঝুমুর। আমার কথা শোন।

অনুরোধের আবেগ নুপুরের কণ্ঠে।

ঝুমুর মুখ তোলে।

নুপুর আবার বলে,—আমি ওদের জানি ঝুমুর। ওদের মন নেই।

ঝুমুর ধীর কণ্ঠে বলে,—না, তুমি জানো না দিদি, ও তেমন নয়।

—আমারও অমন মনে হোত রে। কিন্তু আমার কি করেছে জানিস?

নুপুরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঝুমুর বলে,—জানি দিদি। তবু বলছি, ও তেমন নয়। ওকে ডেকে বলে দেখো।

নুপুর কথা শুনতে পায় যেন অনেক দূর থেকে। ঝুমুরের বিজয়

ওকে যেন কেন্দ্রচ্যুত করে দেয়। ছুঁড়ে দেয় অনেক দূরে। অনেক দূর থেকে যেন বলে নুপুর,—ও তেমন নয়? তুই ঠিক জানিস ঝুমুর।

ঝুমুরের কণ্ঠে নিশ্চিত বিশ্বাস,—আমি ঠিকই জানি দিদি। ও ওর মাকে পর্যন্ত সব বলেছে।

নুপুর শুধোয়,—ও বোধহয় বড়লোক নয়?

ঝুমুর বলে,—বড়লোক নয়। খুব গরীবও নয়।

নুপুরের পূর্ণ পরাজয়। চোখে গভীর হতাশা দেখা যায়। বলে,—তা হয়ত হবে। বড়লোক হলেই হয়ত অমন হোত। জীবনের ব্যবসায়ে ঝুমুর জিতে গেছে। জীবনে পাওনা মোটা অংক জমে উঠেছে ওর। ক্ষতির পাল্যা নুপুরের।

তবু নুপুরের হৃদয় আছে। ও ঝুমুরের এই পরম লাভের সম্ভাবনায় যতখানি মুষড়ে পড়ে, ততখানি জোর দিয়েই বোঝাতে চায় নিজেকে,—ঝুমুরের ভাল হোক। ঝুমুর সুখী হোক।

শুধোয় নুপুর,—ওকি কাল আসবে?

—হ্যাঁ।

নুপুর বলে,—ভালই হবে। মাকে বলে রাখব আজ রাত্তিরে। কাল ও এলে ওর সঙ্গে মায়েরই কথা হবে। তারপর দাদা না হয় একবার যাবে ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে! যত শিগ্‌গির বিয়েটা হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে দেরী করতে চাই না।

ঝুমুর অবাক হয়ে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর ছেলেমানুষের মত জড়িয়ে ধরে দিদিকে।

নুপুর ম্লান মুখে ওর মাথায় হাত বোলায়। আহা কত ছেলেমানুষ ঝুমুর! তুই সুখী হ ঝুমুর। তোর ভাল হোক।

আনন্দের একটানা স্রোত যেন বয়ে যায় যেন ঝুমুরের মনের ওপর

দিয়ে। তবু কোথায় যেন সে স্রোত আটকায় মাঝে মাঝে। মনে হয় দিদির কথা। দিদির কেন এমন হোল? কেন তাকে ঠকতে হোল এমন করে? জীবনে বসন্ত এলো, কিন্তুমুখর হতে পেলো না নিদারুণ পরিবেশের অবধারিত নিষ্ঠুরতায়। মৌন বসন্ত রয়ে গেল বোঝা হয়ে মনের আবেগকেন্দ্রের ওপর। বোবা হয়ে যাবে মনের মধুর মুখরতা আজীবন।

বোবা মনের অসার্থক ওজন নিয়ে বেড়াতে হবে দিনের পর দিন। কি বিশুষ্ক করুণ ভবিষ্যত দিনগুলো!

ঝুমুর চমকে ওঠে, বলে ওঠে,—দিদিগো!

নুপুরও চমকে ওঠে।

ঝুমুর বলে,—তোর সঙ্গে একা একা থাকব দিদি। তোকে ছেড়ে যাব না।

নুপুর তাকায় ঝুমুরের দিকে: পরম স্নেহে। ওর চোখের জল ঝরে এবার।

বলে ও ধীর স্বরে,—পাগলামী করিসনে ঝুমুর। তুই সুখী হলে সত্যি আমার ভাল লাগবে। খুব আনন্দ হবে।

ঝুমুর আর কথা বলতে পারে না।

কিই বা বলবে আর! দিদি যে ওর কত আপনার, সেইটেই যেন আজ মর্মে মর্মে অনুভব করে।

• •

বাসুদেব দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে। বসন্তের শেষ স্পন্দন অনুভব করে বাতাসে। গরম তীব্র জ্বালায় মৃদু আভাষ সুরু হয়েছে বাতাসে। শেষ হয়ে এলো বসন্তের বুক কাঁপানো দিনগুলো!

এক ঝাঁক বক উড়ছে আকাশে। পাক খাচ্ছে শুধু।

অনবরত পাক খেয়ে চলেছে। অনর্থক পরিক্রমায় কি অসাধারণ ধৈর্য! এ কি অর্থহীন। অর্থহীন হয়ত বা নয়। ঝাঁক ধরে ওড়বার আনন্দটুকু পূরো উপভোগ করছে ওরা। দাম আছে এর। বাইরে নয়। অন্তরে।

অন্তরের দাম দেখবার চোখ নেই কারও। সংসারে এ এক নিদারুণ ট্র্যাজেডী! হাতে হাতে লাভ চাই। হাতে হাতে দাম চাই। অনুভূতির দাম, ওটা বুঝতেও যে অনুভূতিরই প্রয়োজন। কে অত গভীরে ডোবে। কে চায় ডুবুরীর মত অন্তরের তলায় চোখ মেলতে। শুভ্র মুক্তোর সন্ধান করতে চাইনে। মুক্তো চাই ওপরে ভেসে।

সংসারে এরা কত কৃপার পাত্র!

ভাবতে ভাবতে হাসি পায় বাসুদেবের।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। মালতী আজ এলো না এখনও।

আজকাল প্রায়ই দেরী হয় মালতীর। এক একদিন রাতও হয়ে যায়। কিছুই বলে না বাসুদেব। এসে হয়ত বলে,—খেয়ে এসেছি। তুমি কি খাবে?

—খিদে নেই। কিছু না খেলেও হয়।

মালতী যেন বাঁচে, হাঁই তুলে বলে,—তাই ভালো। অসুখ বিসুখ করার চেয়ে বরং আজ রাতটা উপোস দাও।

বাসুদেব এ কথার আর জবাব দেয় না।

মালতীর দিকে তাকায়।

চোখের কোণে কাজল। একটু পাউডারের প্রলেপ।

মালতী সাজে আজকাল। সাড়ী কিনেছে কয়েকখানা।

বাসুদেবকে দেখাতে এসেছে,—দেখোত' কেমন হোল?

—ভালই।

যেন কৈফিয়ৎ দেবার ভংগীতে বলে মালতী,—কি কোরব। ওরা সবাই কিনলে, সস্তা দাম। আমায়ও কিনতে হোল। বাসুদেব চুপ করে থাকে। ওরা সবাই যে কে তাও শুধোয় না।

মালতীর ভাবভংগীতে বাসুদেবের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রান্নাটা নেহাৎ করতে হয় করে। অনেক সময়ই আজকাল বলে যায়, ভাত ঢাকা রইল। খেয়ে নিও।

বাসুদেব ঘাড় নাড়ে।

আগে রান্না করে বাসুদেবকে খাইয়ে তবে নিজে খেয়ে বেরোত। এখন অত সময় নেই মালতীর। বেশীর ভাগ দিনই বেরিয়ে যায় অনেক সকাল সকাল। ফেরে হয়ত রাত করে।

বেশীর ভাগ রাতেই বলে, খিদে নেই। খাব না। অথবা খেয়ে এসেছি।

বাসুদেব বলে,—তবে রান্নার কাজ নেই। খিদে তেমন আমারও নেই।

বাসুদেবের জামাদুটো ময়লা হয়ে উঠেছে। মালতী দেখেও দেখে না। একদিন হয়ত বলে,—ড্রাইংক্লিনিংয়ে দিয়ে এসো জামাটা।

—না, থাক,—বলে বাসুদেব।

মালতী আর আপত্তি করে না।

আগে হলে নিজে জামা খুলিয়ে সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দিয়ে তবে বেরোত।

বাসুদেব লক্ষ্য করে সবই। তবু কথা বলে না। যেচে ভিক্ষে করে সেবা নেবার অথবা আদর পাবার চেষ্টা করার মত মূর্খামী বাসুদেব কখনও করবে না।

তাছাড়া খাওয়া পরার ভারটা সেধে যখন মালতী নিয়েছে, তখন

মালতী যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তার বেশী চাইতে গেলে যদি বলে বসে,—পারব না। সেটা সইতে পারবে না।

অপমানের চেয়ে অভাব অনেক ভাল।

বাসুদেব এ শিক্ষা পেয়েছে বহু আগে। ওর স্বভাবই গড়ে উঠেছে এই নীতিতে।

সেদিন সন্ধ্যায় লিখতে বসেছিলো বাসুদেব।

মালতী এলো। হাসতে হাসতে এক গাল পান খেয়ে।

বাসুদেবের হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিলো। সামনে থেকে খাতাটা সরিয়ে দিয়ে বললে,—কি লিখছো?

বাসুদেব' কথা না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় ওর দিকে।

মালতী নিজেই বলে আবার,—একটা ভারী জরুরী কথা আছে।

—কি ?

মালতী যেন গম্ভীর হয়ে যায়,----বড় ভাবনায় পড়েছি।

মালতী গাম্ভীর্যটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়। বিষণ্নতার প্রকাশ নয়, এমন কি বিশেষ কিছু চিন্তার প্রকাশও নয়, এটা বাসুদেবের চোখ এড়ায় না।

বাসুদেব খুব ঠাণ্ডা স্বরে বলে,—কি হোল ?

— ভাবছি, তোমার কথা।

—আমার কথা ?—মৃদু হাসে বাসুদেব।

মালতী গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলে,—বেলারাণী এত করে বলছে স্কুলের হোস্টেলে থাকতে, তাতে নাকি অনেক সুবিধে। তাছাড়া টাকার দিক থেকেও অনেক কম পড়বে।

বাসুদেব মনে মনে হাসে। সহজ স্বরে বলে,—তাই নাকি! বেশ ত' !

—তাই ভাবছি ওখানে গেলে—তোমার আবার এখানে থাকা—।

বাসুদেব বলে,—তুমি যাও।

—যাও বললেই ত' হয় না। তুমি?

বাসুদেব একটু হাসে। মালতীর অনাবশ্যক ব্যস্ততাকে প্রশ্রয় দেয় না।

মালতী চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

বাসুদেব একটা কথাও বলে না।

মালতী জানত যে বাসুদেব কিছু বলবে না। তবু তার কর্তব্য বাসুদেবের কথাটাও ভাবা। তাই বা ভাববে কেন? বাসুদেব তার কে? জীবনে হাওয়ার মত উড়ো উড়ো প্রেমের আভাষে মালতী বাঁচতে পারে না। মেয়েরা পারে না এমন সৃষ্টিছাড়া প্রেমের অনুভূতিতে তৃপ্তি পেতে। তারা যা চায়, তার সবটুকু পেতে চায়। মালতী সংসার চায়। বাসা চায়, আকাশের ভালবাসা নয়, মাটির ভালবাসা চায়, মন চায়, দেহও চায়। আদর চায়, তিরস্কারও চায়। সন্তান চায়, মা হতে চায়।

মালতীর কি দোষ তার যদি আর না ভাল লাগে বাসুদেবের নির্লিপ্ত সঙ্গ। বাসুদেব কি রক্তমাংসের মানুষ? ও চিরটা কালই এমনিধারা। আর আশা নেই বাসুদেবের ওপর। কোন আশা নেই জীবনের পুরো লাভ আদায় করে নেবার। জীবনের বসন্তকে চেপে পিষে নিজে নিষ্পেষিত হতে আর রাজী নয় মালতী।

সে চলে যাবে। সে যাবেই। বাসুদেবের যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

বাসুদেব তেমনি মৃদু হেসে বলে,—তুমি চলে যাও মালতী।

বাসুদেবের ওই নির্লিপ্ত হাসিটা দেখলে গা জ্বলে যায় মালতীর। লোকটার রাগ নেই, হিংসে নেই, কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, মানুষটা কী!

মালতী যথাসম্ভব গম্ভীর হয়েই বলে,—তবে যাই আমি। তুমি বরং এখানেই থাকো।

মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে যাব।

এবারও বাসুদেব এ কথার জবাব দেয় না।

মালতী কথাটা পালটায়,—একটু মাংস আনবে, রান্না করি। তুমিত' মাংস খেতে ভালবাসো।

—থাক না!— বলে বাসুদেব।

—তবে থাক।

মালতী ওঠে। এবার হাত পা ধুতে যাবে কলতলায়, নীচে।

বাসুদেব কলমটা তুলে নেয় হাতে।

উপন্যাস লিখতে সুরু করে।

উপন্যাস শেষ হয়ে এলো প্রায়।

রবীনকেও এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

নুপুর ঝুমুর চলে গেলে ওকেও যেতে হবে।

একবার দেখা হলে হত দেবযানীর সঙ্গে।

সেই যে বলেছিলো আর এসো না আমার কাছে। রবীন আর যায় নি।

আজ যেতে ইচ্ছে হচ্ছে একবার।

দুদিন ধরে দেবযানী নীচেও নামছে না। একবারও দেখেনি রবীন।

ঘরে কি নেই?

সেও কি চলে গেল?

পরশু সন্ধ্যায় একবার সে দেখেছিলো বিনয় বোসকে দেবযানীর ঘরে আসতে।

তারপর থেকে বিনয় বোসকেও দেখা যায় না। দেবযানীকে দেখে না।

ওরা দুজনেই কি তবে চলে গেল?

রবীনের খুব ইচ্ছে হয় ওপরে গিয়ে একবার দেখে আসে।

সেদিন সন্ধ্যায় আর সামলাতে পারে না নিজেকে রবীন। ওপরে উঠে যায় পা টিপে টিপে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে আলো নেই। ঘর অন্ধকার কিন্তু দোর খোলা। ওপাশের ঘরে শিশিরকণা নেই। সমরেনও নেই। ফুলমণি মেয়েটার কর্কশ মুখরতাও নেই। সব যেন থম্ থম্ করছে।

একটু যেন ভয় ভয় করে রবীনের। তবে কি দেবযানীও নেই।

নাই বা থাকল। অন্তরের গভীর স্বাদ অনুভব করতে থাকে রবীন। নাই বা রইল। নিজের প্রেমে নিজে আনন্দময় হতে পেরেছে রবীন। পর দেবযানীর মৃত্যু নেই।

তবু জৈবিক ভয়টাকে পূরো এড়াতে ও পারে না। ঘরের সামনে এগোয়। ভেতরে ঢোকে। অন্ধকারেও লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মেঝের ওপর কি একটা নড়ছে। আলোর সুইচটা জ্বালতে গিয়ে রবীন থমকে যায় একবার।

তারপর আলোটা জ্বালায় মনে সাহস এনে। মেঝেতে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় রবীন। শুয়ে দেবযানী সেন। সেই দেবযানী সেন! সাড়ীটা গায়ে ভাল করে জড়ান নেই। হাত দুখানা ওপরের দিকে তুলে বীভৎস ভঙ্গীতে শুয়ে আছে দেবযানী সেন।

সর্বাংগ ফুলে প্রায় পচে উঠেছে। বসন্ত। সাংঘাতিক রকমের বসন্ত। অপরূপা দেবযানী সেনকে আজ চেনাই যায় না যেন। যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করতে চেষ্টা করছে মাঝে মাঝে। তাও যেন পারছে না।

জ্ঞানও বোধকরি ভাল করে নেই। জ্বরের ঘোরে পড়ে আছে মেঝের ওপর। পাশে একটা কাঁচের গ্লাসে জল ঢাকা। একটা বাটিতে একটু মিছরী। ডেয়ো পিঁপড়েতে ছেয়ে আছে মিছরীর টুকরোগুলো।

এই সেই রূপ-গর্বিতা দেবযানী সেন এম, এ,। চুপ করে সব লক্ষ্য করে রবীন। ওর একটু ঘৃণা হয় না দেবযানীকে দেখে। এক পরম প্রশান্তিতে ক্রমশঃ স্থির হয়ে আসে রবীন।

এগিয়ে যায় কাছে।

সাড়ীটা আলতো করে গায়ে দিয়ে দেয় ওর। কপালে হাত রাখে।

—কে?

—আমি। মৃদু স্বরে উত্তর দেয় রবীন।

দেবযানী ওর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে চোখ তুলে খুব কষ্টে তাকাবার চেষ্টা করে।

ক্ষীণ স্বরে বলে,—কে? বিনয়?

—না। আমি।

নিদারুণ ক্ষোভে যেন আপন মনেই বলে দেবযানী—বিনয় সে আসবে বলে গেল। জ্বর দেখে গেল!

এলো না কেন?

রবীন বুঝতে পারে দিন দুয়েক আগে বিনয় বোস এসে ওর জ্বর আর বসন্ত দেখে গেছে। বিনয় বোস আর আসবে না।

রবীন বলে,—জানি না কেন এলো না। আমি রবীন।

—রবীন।—অনেক কষ্টে চোখ তুলে তাকায় দেবযানী সেন,—তুমি কেন এলে।

রবীন উত্তর দেয় না।

—এতদিন আসোনি কেন?—বলে দেবযানী। রবীনকে দেবযানীই

আসতে বারণ করেছিলো। তবু রবীন সেকথা বলে না। মিষ্টি স্বরে বলে,—এমন ত' জানতুম না। জানলে আসতুম ঠিকই।

দেবযানী যন্ত্রণায় ক্ষীণ আর্তনাদ করে ওঠে। বলে,—আমি আর বাঁচব না রবীন।

রবীন ওর পাশে বসে পড়ে। ফুলো হাতখানা কোলে টেনে নেয়। বলে,—বাঁচবেন। ভয় নেই।

—আমাকে হাসপাতালে দিও না। ভয়ে মরে যাব আমি। বরং—।

রবীন ওকে সমঝায়,—আপনার কথা বলতে হবে না। যা করবার আমি কোরব। বলুন ত' সাড়ী, বিছানার চাদর সব কোথায় ?

দেবযানী নীরবে তোরঙ্গ আনলা দেখিয়ে দেয়। বলে,—ড্রয়ারে চাবি আছে।

—রবীন ওঠে।

ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে সাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে, সাবান প্রয়োজনীয় সব বার করে নেয়। ধীরে ধীরে বিছানার চাদর পাল্টে দেয়। ছোটমেয়ের মত দেবযানীকে আলতো করে ধরে আবার শুইয়ে দেয়।

ময়লা সাড়ী ব্লাউজ চাদর সব নিয়ে সাবান হাতে করে কলতলায় চলে যায়। নীরবে সেগুলো কেচে ওপরে নিয়ে আসে।

দোকানে যায়। বাজার যায়। মিছরী, ফল, মেথী সব নিয়ে আসে।

ঘরে ধুনো দেয়।

ছোটবেলায় তাদের হাম বসন্তে মা যা যা করতেন, সবই মনে করে করে করতে থাকে রবীন।

যেন মায়ের মতই সেবা করতে চায় আজ দেবযানীকে।

রাত বাড়ে। আক, শাকালু খেতে দেয় রবীন দেবযানীকে।

সাবু চাড়িয়ে দেয় ষ্টোভে।

দেবযানী শুয়ে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে রবীনের দিকে তাকায় শুধু।

রবীন ওকে সাবু খাইয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বলে,—খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

দেবযানী একবার তাকায় রবীনের দিকে। চোখে কস্ বেয়ে ওর জল গড়ায়।

রবীন মিষ্টি স্বরে বলে,—ভয় কি! সেরে উঠবেন।

চোখের কোণ মুছিয়ে দেয়।

ক্ষীণ স্বরে বলে দেবযানী,—এবার তুমি যাও। খাবে না?

—আমি যাব না।—এইটুকু শুধু বলে রবীন।

দেবযানী আর কথা বলে না।

রবীন সারা রাত ওর পাশে বসে থাকে। হাওয়া করে। গা চুলকে দেয়। ছোটমেয়ের মত ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। জল দেয় তেষ্টা পেলে।

ভোরের দিকে নিজে একপাশে হেলে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

পাঁচ সাতদিনের অক্লান্ত সেবায় রবীন দেবযানীকে অনেকটা ভাল করে তুলতে পারে। নিজে কাপড় কেচে খাইয়ে শুইয়ে রাতের পর রাত জেগে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনে রবীন।

সেদিন বিকেলে ষ্টোভে গাওয়া ঘিয়ের লুচি আর আলু ভাজা ভেজে বসে রবীন দেবযানীর পাশে,—নিন। খেয়ে নিন।

দেবযানী অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিলো।

রবীন বলে আবার,—কই খেয়ে নিন।

দেবযানী রবীনের দিকে তাকায়। হঠাৎ বলে,—আচ্ছা আমি খুব কুৎসিত হয়ে গেছি, নয়?

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সত্যিই তাই। মুখের বড় গোটাগুলো তখনও সব শুকোয়নি। মুখটা ফোলা-ফোলা। হঠাৎ দেখলে বীভৎস মনে হয়।

তবু হেসে বলে রবীন,—কই, আমি ত' কিছু বুঝি না। অসুখ হলে চেহারার একটু অদল-বদল হয়েই থাকে। তা হোক, খেয়ে নিন।

দেবযানী রবীনের হাতখানা নিজের চোখের ওপর টেনে নেয়। যেন গভীর বেদনায় লজ্জায় চোখ ঢাকতে চায়। কিছুক্ষণের ভেতর রবীন অশ্রুস্পর্শ পায় হাতের তেলোয়। দেবযানী কম্পিত স্বর শোনা যায়,—তুমি আমার চেয়ে কত বড় রবীন!

—কি যে বলেন,—হাসে রবীন,—আপনি কত বিদ্বান! যাক ওসব বাজে কথা।

—না থাকবে না।—রুদ্ধ স্বরে বলে দেবযানী,—বলো তুমি থাকবে আমার কাছে আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না!

রবীন একটু অবাক হয়। এই সেই দেবযানী সেন এম, এ,।

হেসে বলে,—থাক না ওসব কথা!

—না বলো, বলো আমায় ক্ষমা করেছ!

—কিসের ক্ষমা?

—তোমাকে অপমান করেছিলাম, তখন বুঝিনি।

রবীন তাকিয়ে থাকে দেবযানীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে, তারপর গভীর কণ্ঠে বলে,—ক্ষমা অপমান কিছুই বুঝি না। আপনার যা কিছু সব আমার এত ভাল লাগে যে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। এ একান্তই আমার। আমার একার।

কথা কটি খুব সরল। কিন্তু এত সহজ সরল আন্তরিক কথা দেবযানী সেন কখনও শোনেনি। একবিন্দু ফাঁকি নেই এতে। বিগত তেত্রিশ

বছরে বহু ধনীপুত্র, কবি, অধ্যাপক, অফিসার, লেখক কত বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে এসেছে ; কিন্তু এই ছেলেটির এমন সহজ কথা-কটি কখনও শোনেনি দেবযানী।

আবার বলে দেবযানী,—তুমি থাকবে আমার কাছে ?

—না।—তেমনি শান্ত স্বরে বলে রবীন,—না। আপনি সুস্থ হলেই চলে যাব আমি অন্য কোথাও। আপনি যা বলছেন তা' হয় না।

—কেন হয় না ?—দেবযানীর চোখের পাতা দুটি আর্দ্র হয়ে আসে।

রবীন মুখ নীচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

ধীরে ধীরে বলে,—বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। এ হয় না।

দেবযানী চোখ মোছে,—কোথায় যাবে ?

—ঠিকানা আপনাকে জানাব।

—ডাকলে আসবে ?

—যখন ডাকবেন, তখনই আসব।

বলতে বলতে লুচির ডিসখানা এগিয়ে এনে নিজ হাতে লুচি কখানা খাইয়ে দেয় ওকে রবীন। তারপর মুখ মুছিয়ে মাথা চুলকে দিতে দিতে বলে, ঘুমোন। আবার ডেকে খাওয়াব। দেবযানী চোখ বোজে।

কিছুক্ষণের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে।

রবীন আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সামনে পরিষ্কার নীল আকাশ। একটুও মেঘ নেই। ঠিক ওর মনের মতো।

উপন্যাস শেষ হোল বাসুদেবের।

ধীরে ধীরে জানালার ধারে উঠে আসে বাসুদেব।

গুমোট গরমে হেসে ওঠে ও। একটু বাতাস নেই আর। ভারী গুমোট এক আস্তরণ যেন বোঝা হয়ে চেপেছে মনের উপর।

চোখে পড়ে নীচে কলতলার সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে মালতী। বসন্ত চলে গেল। বোঝা হয়ে রইল তার সবটুকু মধু মনের তলায়।

বাসুদেবের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাঙা সমাজের মানুষের গুটিকতক ভগ্নাংশ—আর তাদের জীবনে বসন্তের আর্ত আক্ষেপ।

জানালাটা বন্ধ করে দেয় বাসুদেব।